ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

(প্রথম খণ্ড)

স্বামী সত্যানন্দ

অভিমত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী-প্রণীত নিগম-প্রসাদগ্রন্থাবলী সম্প্র

"সাধন-জীবনে"-সম্পর্কে সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা (দশই ... সংখ্যা ১৩৬৭ বাং) **শ্রীসুদর্শন** বলেন—

চলার পথের বিঘ্ন—চোরাবালির খবর জানা না থাকিলে পথিক যেমন গন্তব্যস্থলে পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রাণ হারাইয়া থাকে—ঠিক তেমনই বিপদসঙ্কুল সাধনপথের সঠিক খবর জানা না থাকিলে সাধনায় সিদ্ধির পরিবর্ত্তে সাধকেরও অধঃপতনই ঘটিয়া থাকে। পথের সঠিক খবর তিনিই দিতে পারেন, যিনি পথের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিয়াছেন। আলোচ্যগ্রন্থে যে সাধনপথের অপূর্ব্ব রূপায়ণ দেখিতে পাই তাহার মুল কথা হইল, স্বামীজী মহারাজ পথ চলিয়াই পথের কথা লিখিয়াছেন—শোনা কথা লেখেন নাই। স্বল্প কথায় সাধন-সঙ্কট এবং তাহা অতিক্রম করিবার এরূপ সুষ্ঠু নির্দ্দেশ আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সাধক এই গ্রন্থের সহায়তা লইলে তাহার যাত্রা সুগম হইবে এবং যাত্রশেষের কৃতকার্য্যতাও তাহার অবশ্য লাভ হইবে।

শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস-সম্পর্কে ২২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৭) রবিবারের **আনন্দবাজার পত্রিকা** বলেন—

ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরমভক্ত সিদ্ধপুরুষ মাধবদাসের জীবনী গৃহীত হইয়াছে। ভক্তমাল পদ্যছন্দে লিখিত প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ। গ্রন্থকার সরল গদ্যে উক্ত জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজে একজন সাধক এবং ভক্তপুরুষ। তাঁহার রচনা আদ্যোপান্ত ভক্ত-জীবনের গূঢ় রসানুভূতির ঔজ্জল্যে আকর্ষণীয় হইয়াছে। বইখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ওঠা যায় না। ভক্তজীবন স্বতঃই মধুর, অনুভূতি-সম্পন্ন সাধকের লেখনীমুখে ইহা সকলের পক্ষে মধুর হইয়া উঠে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া রসিক ভক্তমাত্রই পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১২

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

(প্রথম খণ্ড)

বেদান্তাচার্য তত্ত্ববাচস্পতি
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

দ্বিতীয় সংস্করণ
বুদ্ধপূর্ণিমা—১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

দক্ষিণা : আড়াই টাকা
3.12

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২নং ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট
শ্রীরামপুর
হুগলী

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট
পোঃ—শ্রীরামপুর, জিলা—হুগলী

*

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন, পোঃ ও জেলা—হাওড়া

নিবেদন

"বৈষ্ণব স্মরণ মাত্র সর্ব্বপাপ হরে"—ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীমুখের এই বাণী। "স্মরণ করিলে মাত্র রাখো তুমি দীন"—শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর হরিদাসের অমৃতনিষ্যন্দী এই উক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনায় ছন্দায়িত হইয়াছে। কিন্তু এ বল আমার নাই। শৈশবে ভক্তমাল গ্রন্থখানা পাঠ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। পড়িব কি, নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু তাহাতেই প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল। মনে তখন কত স্বপ্ন জাগিয়াছে, কত ছবি আঁকিয়াছি, ভাবের ঝোঁকে পড়িয়াছি, সেই চোখেই জগৎকে দেখিয়াছি। স্থূল-সূক্ষ্মের বিচার মনে তখন আসে নাই। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বুঝি নাই তখন এ সব কিছু। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলের সংস্কার বুদ্ধির তারে তারে জড়াইয়া সব আঁধার করিয়া ফেলিল, জীবনে ভরিয়া উঠিল হাহাকার। শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামী সরস্বতী মহারাজ আমার মত সংসারাসক্ত জীবের অন্তরে বৈষ্ণবের স্মৃতি, সেই সূত্রে ভগবৎ-স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিলেন। কাজটি বড় সহজ নয়। ভাগবত বলেন, মহতের মুখ হইতে শ্রীভগবানের পদাম্ভোজের সুধাকণাবাহী অনিলের স্পর্শ পাইলে সংসারাসক্ত কুযোগীদের চিত্তেও ভগবৎ-স্মৃতি জাগ্রত হয়। এর চেয়ে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে? সরস্বতী মহারাজ পরম কৃপাবান্ পুরুষ। শ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ন্যায় পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের শিষ্যস্বরূপে সংশ্রয়লাভের সৌভাগ্য তাঁহার মিলিয়াছে। আমার মত কুযোগীর মনে ভগবানের স্মৃতি বিশেষভাবে ভক্তের স্মৃতি উদ্দীপন করা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

ভক্তির সাধনা ব্যক্তভাবে। অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ তত্ত্বে ভক্তি মিলে না। শ্রীভগবানের এই ব্যক্ত ভাবটি আবার ভক্তের আশ্রয়

করিয়াই ফুটিয়া ওঠে। এ বস্তু ভক্তজনের গূঢ় ধন। ভক্তের কৃপা চিত্তে সঞ্চারিত হইলে জড়, চেতন, পরাপ্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি সব উদ্দীপ্ত করিয়া 'অকলঙ্ক পূর্ণকল লাবণ্যজ্যোৎস্নাঝলমল' চিত্রচন্দ্রের উদয় ঘটে, চরাচরে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্বের মহিমা উপলব্ধি হয়। ইহার ফলে সর্ব্বোপাধির বিলয় ঘটে; সব কিছু জুড়িয়া তখন ভগবানের খেলা মনের মূলে খুলিয়া যায়। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সে অবস্থায় সাধক ভগবানের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকেন। তাঁহার সংসার, পুত্র-পরিবার সকলের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের লীলার ছন্দটি তিনি অনুভব করেন। সকলের মধ্যে তিনি দেখেন তাঁহার প্রাণের দেবতাকে। তিনি ছাড়া আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। সর্ব্বতোব্যাপ্ত দীপ্তমাধুর্য্যের এমন চাতুরীতে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আকর্ষণ করেন। তিনি জীবকে আপন করিয়া লন। জীবের জীবন জুড়িয়া ভগবানের তখন অদ্ভুত খেলা সুরু হয়। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অগোচর কিছু নাই কিন্তু ভক্তের প্রতি ভক্তি দেখিলে জীবের অপরাধ সম্বন্ধে তিনিও অন্ধ হইয়া পড়েন এমনই ব্যাপার! অপরাধীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উৎকণ্ঠিত হন।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তের সংবেদনেই শ্রীভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ আমরা জীবনে সত্য করিয়া পাই। প্রেমবস্তুটি যেখানে-সেখানে মিলে না। যিনি অসীম, অনন্ত, অখণ্ড, অব্যয়, ভক্তের মাধুর্য্যবীর্য্যে তাঁহাকে আমাদের কাছে আসিয়া আত্মভাবটি প্রকট করিতে হয়। তাঁহার আত্মভাবের সেই প্রভাবে আমরা নিজেদের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হই; অন্য কথায় স্বরূপ-ধর্ম্ম উপলব্ধি করি।

অব্যক্ত তত্ত্বের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদিগকে নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আঁধারের ভিতর দিয়া তাঁহাদের গতি। সে গতি অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট। প্রত্যক্ষতার বল সেখানে মিলে না। অভীষ্ট

সে অবস্থায় সমুদ্দিষ্ট, স্বভাবধর্ম্মে ঘনিষ্ঠ হয়। সুতরাং পদে পদে আসে সংশয়, জাগে ভয়। নিজের উপরও ভরসা নাই, কখন কি হয়। কিন্তু ব্যক্তভাবের সাধনায় এ সঙ্কট নাই। ভক্তাধীন ভগবান্। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, যিনি তাঁহার ভক্ত, তিনি তাঁহার ভক্ত নহেন, পরন্তু ভক্তের যিনি ভক্ত, তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণটি এই যে ভক্তের প্রতি যিনি ভক্তিপরায়ণ, প্রেমভক্তি তাঁহার অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়াছে। ভক্ত যিনি তিনি অকিঞ্চন। কামনা-বাসনা অন্তরে থাকিলে ভক্তের সেবায় অন্তরে আগ্রহ জাগে না। ভক্তের আনুগত্য যিনি লাভ করিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহার যোগক্ষেম নিজে বহন করেন অর্থাৎ তাঁহার সুবিধা-অসুবিধা তিনি নিজে দেখেন। গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানেরই এই উক্তি, ভক্তের যাহা প্রয়োজন তিনি নিজে তাহার পূরণ করেন। শুধু ইহাই নয়, ভক্তাশ্রিত ব্যক্তভাবের এমন সাধকের জন্য ভগবান্ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। কি ভাবে তাঁহার জন্য তিনি কি করিবেন, এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। কোন অছিলায় তাঁহার জন্য কিছু করিতে পারিলে তিনি যেন বর্ত্তিয়া যান। শ্রীভগবানের প্রেমের এমনই খেলা। এই খেলায় অঘটন ঘটিয়া 'পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণ।'

বাস্তবিক পক্ষে কৃপার রাজ্যে নিত্যই অঘটন ঘটিতেছে এবং আজও ইহা সত্য। আমার মত অভিমানী ভক্তিহীন এ সম্বন্ধে তর্ক তুলিবে। কৃপার শক্তি আমার উপলব্ধিতে আসে না, দৃষ্টির দোষ আমার। ভগবানের আত্মমাধুর্য্যে এবং তাঁহার বীর্য্যে অঘটন ঘটে, এখনও ঘটিতেছে; কিন্তু আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবিশ্বাস্য। আমি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিব, ইহা স্বাভাবিক। আমার মন আমার বুদ্ধি জুড়িয়া রহিয়াছে অহঙ্কার, তাহার ফলে এই বিকার। তর্ক বা যুক্তির জোরে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া কেহ আমাকে ভগবানের আত্মভাবটি বুঝাইতে

পারে না; ভগবৎ-কৃপার শক্তিসম্বন্ধে আমার মনে সেভাবে বিশ্বাস জন্মানোও সম্ভব নয়।

এ সম্বন্ধে শুধু একটি কথাই বলা যায়। সেই কথা এ সম্বন্ধে সর্ব্ব-সিদ্ধান্তসম্মত এবং তাহাই সার কথা। কথাটি এই যে, সাধু বা ভক্তের কৃপার সংস্পর্শ যিনি অন্তরে লাভ করিয়াছেন, ভগবৎ-প্রেমের পরম মাধুর্য্য তাঁহার কাছেই উন্মুক্ত হয়। শ্রীভগবানের বদান্য মহিমায় তিনি ধন্য হন। তাঁহার জীবনের দৈন্য কাটিয়া যায়। সর্ব্বভাবে তিনি জীবনে ভগবৎ-প্রেমের ছন্দোময় সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। একেবারে খোলা চোখে তিনি ভগবান্‌কে দেখেন এবং তাঁহার সঙ্গে মাখামাখির ভাবটি অন্তরে তাঁহার পাকা হইয়া যায়। তিনি যে দিকে তাকান সবই চমৎকার। তাঁহার অন্তরে-বাহিরে ফুটিয়া উঠে শ্রীভগবানের চিদাকার।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ আমাদের সবচেয়ে আপন। কিন্তু শুধু বচন আওড়াইয়া এই সত্যটি উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহার সঙ্গে নিজ সম্বন্ধের বীজটি খুঁজিতে হইলে ভক্তের কাছে যাইতে হয়; ভক্তের পায়ে পড়িতে হয়, সর্ব্বভাবে ভক্তের আনুগত্য স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রেমকে যিনি নিজে দেখিয়াছেন তিনিই প্রেমের প্রভাবে পড়েন, বিচারের পথে প্রেম মিলে না। প্রেমের রাজ্যে মাপ নাই, আছে তাপ। সেখানে আমাদের যুক্তিবুদ্ধির নিরিখে হিসাব চলে না। প্রেমকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। প্রেম প্রমূর্ত্ত সত্য। প্রত্যক্ষতার পরম বলে, প্রেম উজ্জ্বল। ভক্তই এই দিক হইতে ভগবৎ-প্রেমের বিগ্রহ মূর্ত্তি। তাঁহাকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই। ভক্তের অনুগ্রহকে আশ্রয় করিয়া এইরূপে প্রেমের দেবতা আমাদের জীবনে জাগ্রত হন এবং তাঁহাকে পাইয়া আমাদের প্রয়োজন মিটে। ভক্ত ভগবানের নিজ; এই নিজ লাভে ভগবানের পূর্ণতা এবং এমন পূর্ণতায় তাঁহার অযাচিত করুণার উৎস

খুলিয়া যায়। ভগবৎকৃপার সেই প্লাবনে আমরা ডুবিয়া যাই। সেই ডুবে রূপের রাজ্য আমাদের দৃষ্টিতে খোলে। জীবনে প্রেমভক্তির অনুভূতির ইহাই রীতি। অন্য পথে এদিকে-ওদিকে ঠোকাঠুকি করিতে গেলে আমাদিগকে ফাঁকিতেই পড়িতে হয়, জীবনের পরম প্রয়োজন প্রেমবস্তু মিলে না।

সরস্বতী মহারাজ সোজাপথটি ধরাইয়া দিয়াছেন। ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে তাঁহার অন্তরের রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষা এক্ষেত্রে ভাবের বৈভব বিস্তার করিয়াছে। ভক্তচরিত্রের নিগূঢ় মাধুর্য্যের তাৎপর্য্য সরস, সরল, অনবদ্য এবং অনুপম তাঁহার বাচন-ভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে মূল ভক্তমাল গ্রন্থের ভাব আমাদের উপলব্ধির পক্ষে সহজ হইয়াছে। সরস্বতী মহারাজের এমন অবদানকে আমরা যেন অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। তবেই আমাদের প্রয়োজন মিটিবে। ভগবৎ-প্রেমলাভের বৈজ্ঞানিক ধারাটি সরস্বতী মহারাজ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে-পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, সে-পথে পরাজয়ের ভয় নাই, পরন্তু জয়লাভ সুনিশ্চিত। তিনি আমাদের আঁধার পথে আলোকের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহার জয় হোক্। সরস্বতী মহারাজের চরণে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করিবার এই সুযোগ পাইয়া আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন,
বাগবাজার
কলিকাতা

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

গ্রন্থকারের বক্তব্য

ভক্তমালের 'শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস'-চরিতের পরম সমাদর দেখিয়া অন্যান্য চরিত আলোচনারও একটা তীব্র পিপাসা আমার অন্তরে জাগ্রত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই ফল। সমগ্র ভক্ত-চরিত্রকে এই ভাবে খণ্ড খণ্ড গ্রন্থাকারে সম্পাদন করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করারও ইচ্ছা আছে। ভক্তকৃপাই আমার এই অভিলাষপূরণের একমাত্র সম্বল।

ভক্তচরিত্র বিমুখী জীবকে পরেশেসাম্মুখ্য প্রদান করে। ঈশ্বরমুখী হয় জীব যাহা দ্বারা তাহাই পুণ্য বা ধর্ম্মসাধক, আর ঈশ্বরবিমুখী করে যাহা, তাহাই পাপ বা ধর্ম্মবাধক। ভক্তবৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। ভক্তচরিত পাঠের ফল সদ্য লাভ হয়, ইহাতে ক্রমের অপেক্ষা নাই। শ্রবণমঙ্গল এই ভক্তচরিত। সাধন-ভজন করিবার রুচি, ধৈর্য্য কাম-কামনায়-আতুর জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভাগবত মহাজনের চরিত্র শ্রবণে ভগবৎ-মাহাত্ম্য শ্রোতার অন্তরে সহজে এবং শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়। ভিতরের ময়লা তাহাতে আপনি অপসারিত হইয়া যায়। পৃথক্ ভজনের কোন অপেক্ষা আর তখন থাকে না। কলি-উপহত জীবের পক্ষে ভক্ত-চরিত আলোচনা মৃতসঞ্জীবনী সুধার ন্যায়ই কার্য্য করে।

ভক্তমহিমা-কীর্ত্তনে স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত পঞ্চমুখ। ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভক্তের অন্তরঙ্গ অনুভূতির আস্বাদন পাওয়ার জন্য পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত ব্যাকুল-চঞ্চল। এই লোভ সংবরণের ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই। ভক্তঋণ স্বয়ং ভগবান্ও পরিশোধ করিতে অক্ষম। ভক্তসঙ্গ বা ভক্তকৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরের

কৃপা লাভ হয় না। অধরা ভগবান্ ভক্তের মধ্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, এইখানেই ভগবান্‌কে পাওয়া সুলভ। নতুবা অব্যক্তের দর্শন অন্যত্র অসম্ভব। অক্রোধ পরমানন্দ ভূরিদাতা পরম দয়াল নিত্যানন্দের আশ্রয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করা যায়। ইহাই যথার্থ ক্রম। এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবৎকৃপালাভ অসম্ভব। ভক্তকে অনাদর করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই ভগবদনুকম্পার অধিকারী হইতে পারেন নাই।

পরম প্রেমাস্পদ ভক্তিভারতী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনের সঙ্গলাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তিনি একজন তেজস্বী বৈষ্ণব—পরম ভক্ত। ভক্তের ভিতর দিয়া ভগবানের সংস্পর্শজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা যায়। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণে নিজের অজ্ঞাতসারে চিত্ত ভগবদভিমুখী হইয়া যায়। ইঁহাদের মত ভাগবত মহাজনের নিকটই বস্তুর যথার্থ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। 'ভক্তমালের ভক্ত-চরিত' গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া 'নিবেদনে' তিনি যে সন্দেশ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব আস্বাদনযুক্ত। যত পড়ি, আনন্দ ততই বর্দ্ধিত হয়। মহাশয় ব্যক্তিদের সঙ্গলাভ অব্যর্থ। ভাগবত-মহাজনের সঙ্গফলে বিমুখী চিত্ত সহজে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। এই জাতীয় ভক্তসঙ্গলাভ ক্রমশঃ বর্ত্তমানে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। জগৎ অসার, ব্যর্থ যদি ভগবৎ-ভক্ত-সঙ্গ লাভ করিতে না পারে। তবে ইহাও ঠিক, পরমেশ্বরের কৃপায় জগৎ কখনো ভক্তশূন্য হয় না। ভক্তের বিনাশ নাই, ইহা স্বয়ং ভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি। একটু আগ্রহ থাকিলেই ভক্তসঙ্গ লাভ করা যায়। সঙ্গ দুর্ল্লভ বটে; কিন্তু একেবারে দুষ্প্রাপ্যও নহে। জগৎকে বাঁচাইতে সক্ষম একমাত্র ধন্বন্তরী—ভক্ত! ভক্তমালে এইরূপ অসংখ্য ভক্তচরিত-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ় জনসাধারণের পক্ষে ভক্ত-চরিতপাঠে অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ ভক্তির বিগ্রহ-স্বরূপ। এই বিগ্রহকে যেন আমরা প্রীতির সহিত প্রত্যহ পূজা করি। মলিন-চিত্ত জীবের পক্ষে একমাত্র জীবাতু এই ভক্ত-চরিত। জগন্মঙ্গলকর ভক্ত-চরিত ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া জীবের পরম হিত সাধন করুক—ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ভগবানের প্রিয় ভক্তের জয় হউক, নিরপেক্ষ ভক্তির মহিমায় জগজ্জন বিমুগ্ধ হউক।

শ্রীরামপুর,
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ সন

স্বামী সত্যানন্দ

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

(প্রথম খণ্ড)

সেফাইবেশে শ্যামলসুন্দর

"একান্ত নির্ভরশীল ভক্তের সমুদায় ভার স্বয়ং ভগবান্ই বহন করিয়া থাকেন।"—আমরা ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরশীল হইতে পারি না বলিয়াই এই বাণীটিকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁহারা প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ তাহাদের জন্য সব কিছুই করিতে পারেন।

ভগবদারাধনায় সংসারের কাজ পণ্ড হয় না ; সন্ধ্যা-পূজা, তপ-জপ, ধ্যান-ধারণায় যে সময়টুকু ব্যয় হয়, সেই সময়টুকু অপব্যয় নহে। আমাদের মাঝে এমন অনেক ফাঁকিবাজ লোক আছেন, যাঁহারা বলেন তপ-জপ, ধ্যান-ধারণা করিলে নাকি তাঁহাদের সংসারের কাজের ক্ষতি হয়, কিন্তু তাঁহারা এই কথাটা ভাবিয়া দেখেন না যে, তপ-জপ করায় সাংসারিক কার্য্যের যে ক্ষতিটুকু হয়, তদপেক্ষা বেশি ক্ষতি হয় তপ-জপ না করিলে। ভগবানের সংসারে, ভগবানের নাম করিলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়—ইহা কিরূপে সম্ভব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

জীবের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্য্যের প্রতি ভগবানের সুতীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে। ভগবান্ যখন দেখেন, ভক্ত তাঁহারই জন্য যে সময়টুকু ধ্যান-ধারণায়, পূজা-অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেছে, সেই সময়টুকু না হইলে তাহার সংসারই চলিবে না, তখন ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া ভক্তের হইয়া ভক্তের সংসারের সকল অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিয়া যান। ইহা কোন কাল্পনিক কথা নহে, ভক্তের জন্য সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের এইরূপ প্রকট লীলা অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং যদি নিষ্ঠাবান প্রকৃত ভক্তের জাগতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগাদির পূরণের সুব্যবস্থা না করিতেন—তাহা হইলে মানুষ যে ভগবানের মহিমায় অবিশ্বাসী হইয়া পড়িত! ভগবানের নাম করিয়া কাহারও কোন দিন কোন বিষয়ে পতন হইতে পারে না; বরঞ্চ ভগবানের নাম না করাতেই মানুষের অধিক পতন হয়।

ভগবান্ আমাদের ন্যায় অন্ধ নহেন, তিনি **বিশ্বতশ্চক্ষুঃ**। ভগবানের আরাধনায় যদি নিত্যনৈমিত্তিক সাংসারিক কোন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে ভগবানই সেই বিশৃঙ্খলা যাহাতে না ঘটিতেপারে তাহার জন্য পরোক্ষে-অপরোক্ষে থাকিয়া সুব্যবস্থা করেন। মোট কথা তাঁহার রাজ্যে কোথায়ও অবিচার নাই। **সংসার অপেক্ষা সংসার-স্রষ্টা ভগবান্ অনেক বড়।** প্রকৃত নির্ভরশীল ভক্ত আর কোন কর্ত্তব্যকে বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না—তাঁহাদের নিকট ভগবদারাধনাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া যদি আর অন্যদিকের কর্তব্যের অবহেলাও হয়, তাহা হইলে ভক্ত সেই দোষে নিজকে দোষী মনে করেন না। নির্ভরশীলের তো কোন দায়িত্ব নাই—সকল দায়িত্ব গিয়া পড়ে তখন ইষ্ট বা ভগবানের উপর। ভগবান্ যখন

দেখেন, ভক্ত সত্যি সত্যি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানে না, ভাবে না, বুঝে না—তখন সেই একনিষ্ঠ ভক্তের ভাল-মন্দ সকল কার্য্যের দরুন তিনি নিজকেই দায়ী মনে করেন। ভক্তের সকল দায়িত্ব যখন ভগবান্ নিজে বহন করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তখন কোন কার্য্যে যাহাতে ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয়, সেই ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হয়। এইভাবে তিনি যে কত একনিষ্ঠ ভক্তের কলঙ্ক দূর করিবার দরুন স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা **শ্রীভক্তমাল** গ্রন্থ হইতে একজন একনিষ্ঠ ভক্তের দরুন ভগবান্ কিরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহারই লীলাকাহিনী বর্ণনা করিব। অবিশ্বাসী, কূট-তার্কিক এইসব কাহিনীকে অসম্ভব, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াও দিতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি, যাঁহারা ভক্তিমার্গের পথিক, তাঁহাদের প্রাণে ভগবানের এইরূপ লীলাকাহিনী অপূর্ব্ব আশা এবং আনন্দোল্লাসের সঞ্চার করিবে। ভক্তের প্রাণ এই সব কাহিনী পাঠ করিয়া আরও দ্রুত পরমেশ্বরাভিমুখী হউক—ভগবচ্চরণে আমাদের ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

জয়মল নামে এক শুদ্ধমতি রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা অনুরাগ ছিল। ভক্তিঅঙ্গ যাজনে একদিনের তরেও তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না। একদিন মন বসিল তো সমস্ত দিনই পূজার্চ্চনায় কাটাইয়া দিলাম, আর একদিন হয়ত পূজার ঘরেই প্রবেশ করিলাম না—নিয়মের এইরূপ ব্যভিচার হইলে মানুষ কোনদিন পূজার্চ্চনায়, ধ্যান-ধারণায় সুফল লাভ করিতে পারে না। যাহা করিব তাহাতে একটা সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকা চাই। প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলেও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত তাঁহার প্রাণাধিক তপ-জপ-ব্রত-নিয়মাদি পরিত্যাগ

করিতে পারেন না। এইরূপ ভাবে প্রাণ দিয়া নিয়মকে আঁকড়াইয়া ধরেন বলিয়াই, নিষ্ঠাবান ভক্তের যম-নিয়ম পালনে একটা দৈবীশক্তির উন্মেষ হয়। দুর্ব্বল-চিত্ত মানব দুই দিনেই চায় ফল লাভ করিতে। পূজার্চ্চনায় বসিতে না বসিতেই তাহাদের ইষ্টসিদ্ধি হওয়া চাই। একটা নিয়ম দুই দিনও পালন না করিয়াই, তাঁহারা সেই নিয়মে যে যথার্থই কিছু নাই, বিজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসেন। নিয়ম বা অভ্যাস দুই দিনেই দৃঢ় বা অবিচলিত হয় না। "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ"—(পাতঞ্জল দর্শন)। অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদাসর্ব্বদা ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে তবেই তাহা ক্রমে দৃঢ় এবং অবিচলিত হয়। বস্তুতঃ অভ্যাস দু'পাচ দিনে দৃঢ় হয় না। দুই একবার করিলেও হয় না। অযত্নপূর্ব্বক করিলেও হয় না। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত, সদাসর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিরামের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া যাঁহাদের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগটুকু পর্য্যন্ত হইয়া উঠে না, তাঁহারাই চান ঋষিপ্রবর্ত্তিত নিয়মাদির দোষ ধরিতে এবং নিয়মের ব্যর্থতা প্রমাণ করিতে। নিষ্ঠাচ্যুত হইয়া পড়াতেই যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের এই দুর্দ্দশা, তাহা কেহই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। নিষ্ঠার ভাব না থাকিলে স্বেচ্ছাচারদ্বারা কি আর মানুষ কোন ক্রিয়ার ফল লাভ করিতে পারে? আমাদের রাজা জয়মল কিন্তু স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল নৃপতি ছিলেন না। তিনি নিজে ছিলেন ভগবদ্বিশ্বাসী, সুতরাং তাঁহার রাজ্য হইতে ভগবৎপূজা, প্রজাবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাধুসজ্জনদিগের আশ্রয়দানরূপ ধর্ম্ম তখনো নির্ব্বাসিত হয় নাই। তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত নিত্যনিয়মিতভাবে নিজ হস্তে

শ্যামলসুন্দর নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা-পরিচর্য্যা করিতেন। একমাত্র শ্যামলসুন্দর ব্যতিরেকে আর অন্য কোন দেব-দেবীকে তিনি জানিতেন না।

ভক্তি অঙ্গ যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেক যেন নাহি বেশী কম॥
শ্যামলসুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা।
তাহাতে প্রপন্ন নাহি জানে দেবী দেবা॥
দশদণ্ড বেলা তক্ তাঁহার সেবায়।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ় নিয়ম হয়॥
রাজ্য ধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায়॥

রাজা জয়মল যখন শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইতেন, তখন বহির্জ্জগতের সব কিছু ভুলিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং আরাধনায় নিরত থাকিবার কালে, তাঁহার মস্তিষ্কে রাজ্যপরিচালনার চিন্তা উদয় হইত না। ধ্যান করিতে বসিয়া ধ্যেয় ছাড়িয়া তাঁহার মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইত না। এইরূপভাবে সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে কি আর অভীষ্টসিদ্ধি হয়? ভগবান্ কি আর যাহার-তাহার বোঝা বহন করিয়া মরেন? "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" যাঁহারা ভগবানে নিত্যযুক্ত, ভগবান্ তাঁহাদেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। ইষ্ট বা লক্ষ্যও এক হওয়া চাই; কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা—বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি চিত্ত প্রধাবিত হইলে, সেই চিত্ত কখনও অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভ করিতে পারে না। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তি-

র্বিশিষ্যতে।" চিত্ত স্থির করিতে হইলে মন-বুদ্ধিকে একের চিন্তায় নিয়োগ করিতে হয়। রাজা জয়মল একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার এই ভক্তি-অঙ্গ যাজনের সুদৃঢ় নিয়মের কথা দেশ-বিদেশেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই জানিত, 'রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়' রাজা তাঁহার নিত্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের তিলমাত্র ব্যতিক্রমও করেন না।

প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশকালে আইল হানা দিয়া॥

দুষ্টলোকের চিরকালই দুষ্টবুদ্ধি। আর রাজ্যবিস্তারের লিপ্সা একবার যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহার কি আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে? ছলে, বলে, কৌশলে অপরের রাজ্য জয় করিতে পারিলেই হইল। প্রতি-যোগী রাজা ভাবিলেন, রাজা জয়মলের রাজ্য আক্রমণ করিবার ইহাই অপূর্ব্ব সুযোগ, কেননা পূজার্চ্চনা ছাড়িয়া রাজা যুদ্ধ করিবার দরুন কিছুতেই অগ্রসর হইবেন না। এই ভাবিয়া তিনি রাজা জয়মলের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। রাজা জয়মলের যথেষ্ট সৈন্য-সামন্ত আছে বটে, কিন্তু রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে তাহারা যুদ্ধ করিবে কেমন করিয়া?

রাজার হুকুম বিনে সৈন্য আদিগণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥
মাতা তাঁর আসি কহে করি উচ্চধ্বনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥
সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নৈল॥

প্রতিযোগী রাজার সৈন্যগণ কোনরূপ বাধা না পাইয়া রাজা জয়মলের গড় পর্য্যন্ত ঘিরিয়া বসিল। কিন্তু রাজার এই সব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি আপন মনে শ্যামলসুন্দর বিগ্রহের পূজার্চ্চনায় এবং ধ্যানে বিভোর। এদিকে রাজা জয়মলের মাতা দেখেন সম্মুখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তিনি তো আর তাঁহার পুত্রের ন্যায় ভগবন্নির্ভরশীল নহেন, সুতরাং উপস্থিত বিপদের কথা ভাবিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি একেবারে শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত এবং উচ্চৈঃস্বরে 'রাজ্য গেল' 'রাজ্য গেল' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভগবদ্ধ্যানেনিরত ব্যক্তির বাহিরের এই চীৎকারেই বা কি হইবে, কেননা পূজার্চ্চনার সময় তো প্রকৃত ভক্তের মন বহির্জ্জগতে পড়িয়া থাকে না। যাহা হউক মাতার বারংবার চীৎকারের ফলে রাজা জয়মল স্থির-ধীর-গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন—

জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমা সভার উদ্যমে কি করে॥

রাজা জয়মল যে শক্তিসামর্থ্যবিহীন, আলস্যপরায়ণ, প্রতিযোগী রাজার ভয়ে ভীত ছিলেন তাহা নহে। তিনি নিত্যনিয়মিত পূজার্চ্চনাকে রাজ্যাপেক্ষাও বেশী মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পূজার্চ্চনার সময়েই যখন এই বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত তখন নিশ্চয়ই ইহার মাঝে শ্যামলসুন্দরের শুভ-ইচ্ছাই বর্ত্তমান। রাজ্য যদি রক্ষাই হইবে, তাহা হইলে আমার এই নিত্যনিয়মিত অনুষ্ঠানের সময়েই বা কেন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিল। অথবা যাঁহার রাজ্য

২

তিনিই হয়ত রক্ষা করিবেন। রাজা জয়মল তাঁহার মাতৃদেবীকে বলিলেন—"মা তুমি তোমার আপন কার্য্যে তৎপর হও, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, যাঁহার রাজ্য তিনিই রক্ষা করিবেন। রাজ্যরক্ষা যদি শ্যামলসুন্দরের ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে আমি পূজা ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেও কিছু ফল হইবে না।" কতখানি ভগবন্নির্ভরপরায়ণ হইলে যে প্রাণ হইতে এইরূপ কথা বাহির হয়, তাহা সকলকেই একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। নির্ভরশীল ভক্ত—নির্ভর করিয়াই মুক্ত। তাঁহার তখন চিন্তা, উদ্বেগ, অশান্তি থাকিবে কেন?

এদিকে বিপক্ষের সৈন্যগণ রাজ্য আক্রমণে ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, ভক্তের ভগবান্ শ্যামলসুন্দর নিজেই তখন তাহার প্রতিকারে উদ্যোগী হইলেন। তাহা না করিলে যে তাঁহারই কলঙ্ক রটিত হইবে। লোকে বলিবে, রাজা জয়মল শ্যামলসুন্দরের পূজার্চ্চনা করিয়াই রাজ্য হারাইল।

শ্যামলসুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেল অস্ত্র ধরিয়া॥
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যগণ মারি।
আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি॥

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ইচ্ছামাত্র তিনি সকল রূপই ধারণ করিতে পারেন। ভক্ত যাঁহার ধ্যান করে, তিনি তো আর অচেতন নহেন—তিনি যে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। যে ভক্ত ভগবানের জন্য রাজ্য, ধন, মান, সব বিসর্জ্জন দিয়া তদ্গত হইতে পারিল, ভগবান্ কি আর সেই ভক্তের দরুন কিছু না করিয়া থাকিতে পারেন? ভগবান্ সর্ব্বত্র যোগবিভূতি প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু প্রয়োজন

পড়িলে আবার করিয়াও থাকেন। এই যুদ্ধব্যাপারে ভগবান্ বিভূতি প্রকাশ করিলেন। একা তিনি শ্যামলসেফাই সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া আসিলেন।

এদিকে এতক্ষণে রাজা জয়মলের শ্রীবিগ্রহসেবা শেষ হইয়াছে। তিনি তখন সেবা-সমাপনান্তে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইলেন।

সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল॥
সভে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনিল॥

রাজা জয়মলের চিত্ত সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল। অশ্ব তো কোনদিন মন্দিরদ্বারে বাঁধা থাকে না—এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিল? তারপর ঘোড়াটাকেও দেখিতেছি শ্রান্ত, ক্লান্ত, সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘর্ম্ম। রাজা তখন ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একে একে সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই এই একই উত্তর—"আমরা জানি না কে বা ঘোড়ার সওয়ার হইল, আর কেই বা ঘোড়াকে আনিয়া মন্দিরদ্বারে বান্ধিল।"

সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্যসামন্তসহ চলিল যুদ্ধেতে॥

রাজা কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ এইখানেই আমরা তাহার প্রমাণ পাই। যতক্ষণ ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনায় নিরত ছিলেন, ততক্ষণ তাহাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, এখন সেই কর্ত্তব্য সমাপনান্তে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ

করিলেন। রাজ্যবিষয়ক চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। প্রতিযোগী রাজার রাজ্য-আক্রমণের কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি তখন কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। এখনো রাজা জয়মল বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার হইয়া তাঁহারই প্রাণপ্রিয়তম দেবতা শ্যামলসুন্দর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া রাজা অচিরেই তাহার প্রমাণ পাইলেন।

যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের সৈন্য।
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥
প্রধান যে রাজা সেই শেষ মাত্র আছে।
বিস্ময় হইয়া ঞিঁহ কারণ কি পুছে॥
হেনকালে সেই প্রতিযোগী যে রাজা।
গলবস্ত্র হইয়া লইয়া বহু পূজা॥
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি জোড় হাতে॥
কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেফাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্য বিজই॥
অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহ॥
শ্যামল সেফাই যেই লড়িতে আইল।
তোমাসনে প্রীতি কি তার বিবরিয়া বল॥
সৈন্য যে মারিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশন মাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥

যাঁহার ভুবনমোহন রূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী যাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া যে জয়মলরাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর চিত্তলয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জগতের রাজা যিনি, তাঁহার সঙ্গে কি আর অল্পপ্রাণ, ক্ষুদ্র পার্থিব রাজার যুদ্ধ করা সাজে? জীবের সাধ্য কি ভগবানের সঙ্গে লড়াই করিয়া পারে? তবে এক জায়গায় ভগবান্ জীবের কাছে পরাজিত, তাহা কোথায়?—না, একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে। ভগবান্ মায়াধীশ—কিন্তু ভক্তাধীন। ভক্তের দরুন ভগবান্ সবই করিতে পারেন। যুদ্ধে সেফাই সাজিয়া আসিলেন তিনি কেন? —না, ভক্তের জন্য, ভক্তের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য।

রাজার পক্ষে রাজ্যহারা হওয়ার চেয়ে বড় অসম্মান, ক্ষতি আর কিছুই নাই। ভগবান্ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে দিয়া রাজ্য আক্রমণ করাইয়া জয়মলের একান্ত নির্ভরশীলতার শেষপরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ভক্ত ভগবানেরই অপার অনুগ্রহে শেষপরীক্ষাতেও সফলতা লাভ করিলেন।

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—ইহা শ্রীভগবানেরই উক্তি। তিনি সব কিছু ধ্বংস করিতে আসেন না—তিনি আসেন জগতে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে, লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে। লোকই যদি না থাকিল, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন কাহাদের? ভগবান্ আর সব সৈন্যকে নিহত করিলেন, কিন্তু যাহার প্রায়োজন, সেই জয়মলের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। যদি তিনি রাজার প্রাণ বিনাশ করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার লীলা প্রকট হইত কেমন করিয়া?

রাজা জয়মল এতক্ষণে সব ব্যাপারই বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্যামল-সেফাই নামে অশ্বারোহীবেশে কে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আর এতটুকুও বুঝিতে বাকী নাই।

জয়মল বুঝিল এই শ্যামলজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম ॥

এখন আর রাজা জয়মলের সঙ্গে প্রতিযোগী রাজার সেই শত্রুতার ভাব নাই। শ্যামলসুন্দরের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করিয়া তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য রূপান্তর আসিয়াছে। অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এখন তিনি জয়মলকেই তাঁহার রাজ্য বিলাইয়া দিবার দরুন প্রস্তুত। ভগবৎসংস্পর্শে কি-ই না হইতে পারে? তাঁহার সংস্পর্শে লৌহও যে কাঞ্চনে পরিণত হয়!

জয়মল তাঁহার প্রতিযোগী রাজার অনুশোচনা এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন প্রতিবেশী রাজাকে বন্ধুর ন্যায় সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন—"ভাই, এই সংসারের রাজা কে?—একমাত্র ভগবান্। আমরা যে রাজা, এই গর্ব্ব করাই আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তুমি সেই ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিাছ। এখন তোমার অভিমান আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ভাই! যিনি পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার আশ্রয় লইলে—শরণাপন্ন হইলে কোথায়ও কোন বিষয়ের অভাব থাকে না। তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; তুমি ভগবানের সেবক, তাঁহার হস্তের যন্ত্রমাত্র—এই ভাব মনে মনে পোষণ করিয়া রাজ্য-পরিচালনা করিয়া যাও. দেখিবে ইহাতে তোমার কোন দিকে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে না।"

ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে এবং ভগবদ্ভক্তের এইরূপ অপূর্ব্ব উপদেশবাণী শ্রবণে—প্রতিযোগী রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন, এবং নিষ্কামভাবে রাজ্যপরিচালনার সময় রাজ্যপরিচালনা করিয়া বাকী সময়টুকু ভগবৎচিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পরমভক্ত জয়মলের কথা আর কি বলিব? তিনি এখন রাজ্যে থাকিয়াও রাজ্যচিন্তার অতীত। দিবা-রাত্র এক শ্যামলসুন্দরের ধ্যানেই তিনি নিমগ্ন। রাজ্যপরিচালনার চিন্তা এখন আর তাঁহার নহে—স্বয়ং ভগবানের। ভক্তাধীন ভগবানেরও ইহাতেই সুখ, ইহাতেই আনন্দ। তিনিও ইহাই চাহেন যে, জীব তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া, সকল দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে সংসারে কয়টা দিন বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া যাউক। তিনি জীবকে অহরহঃ এই বাণী শুনাইতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ভক্ত-জীবনে ভগবানের অপূর্ব্বলীলা সন্দর্শন করিয়াও যদি আমাদের মোহ-ভ্রান্তি বিদূরিত না হয়, আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হইতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—আমরা অভিশপ্ত—হতভাগ্য!

প্রেমসম্পুট

প্রেমভক্তি হৃদয়সম্পুটে অতি গোপনে রাখিতে হয়, প্রেম বাজারের জিনিস বা বস্তু নয়। আর সবই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রেম আজ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই—প্রেম অনির্ব্বচনীয়। 'মূকাস্বাদনবৎ' প্রেম ভিতরে-ভিতরে আস্বাদনেরই লোভনীয় স্বর্গীয় সম্পদ। সব কথারই শেষ আছে, কিন্তু প্রেমের শেষ নাই, অবধি নাই। কোন কোন ভাগ্যবান্ প্রেমিক-ভক্তে প্রেম প্রকাশিত হয় মাত্র। তবে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিলেও, প্রেমের দীপ্তি আছে, বিকাশ আছে। লক্ষণ দেখিয়া কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। মহাজনের বাণী—"প্রেমরত্ন ধন রাখ্‌তে হয় গোপনে।" প্রেম স্বর্গীয়, দুর্লভ সামগ্রী। ভগবৎকৃপায় এবং মহা-জনের কৃপায় প্রেম আবির্ভূত হয়। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, কভু সাধ্য নয়।" প্রেম নিত্যসিদ্ধ, সাধনার বস্তু নয়। গোপনীয় বস্তুকে কতখানি সতর্কতার সহিত গোপনে রাখিতে হয়, তাহারই একটি সত্য ঘটনা ভক্তমাল হইতে ভক্তদের উপহার দিতেছি।

এক রাজা হয় যে অন্তরে হরিভক্ত।
গোপনে রাখয়ে কোনরূপে নহে ব্যক্ত॥
রাণী তাঁর বৈষ্ণবী পরম মহাভক্ত।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তরে উত্যক্ত॥
সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুর্দ্দৈব।
স্বামী মোর হরিভক্তিবিহীন অশিব॥

স্বামীরে বুঝায় তেঁহো কিছু না কহয়।
উদাসীনন্যায় কিন্তু মনে প্রশংসয়॥

হরিভক্ত রাজার প্রকৃতই ভক্তি ছিল, কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল না। বাহ্যিক প্রকাশ না দেখিয়া রাণীর মনে খুবই দুঃখ অনুভব হইত। রাজা যে-ধন গোপনে রাখিয়া আস্বাদন করিতেছিলেন, রাণী চাহিতেন ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া তাহা বিকশিত হউক ; কিন্তু শুদ্ধপ্রেম কি ঐশ্বর্য্যের জিনিস ? "ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি"—ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সঙ্কুচিত প্রেমে যে ভগবান্ও প্রীতিলাভ করেন না। যাহা হউক একদিন অত্যাশ্চর্য্যভাবে রাণীর সকল সংশয়-দ্বিধার নিরসন হইয়া গেল।

একদিন দৈবাৎ রাজন নিদ্রাকালে।
অলস ত্যজিয়ে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
রাণী তাহা শুনিঞা পরমানন্দ হৈল।
দানাদি করিল নহবৎ বসাইল॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল।
আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি বল॥

রাত্রিতে একদিন ঘুমের ঘোরে রাজার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া রাণী ত খুবই আনন্দিতা হইলেন। শুধু তাহাই নয়, আনন্দে ইহার জন্য কত দানাদিও হইল। রাজা ত হঠাৎ রাণীর এইসব দান-ব্রত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—আকস্মিক তোমার এইসব অনুষ্ঠানের কি তাৎপর্য্য ?

প্রফুল্ল বদনে রাণী রাজারে কহিল।
আজি তব মুখে কৃষ্ণনাম নিকশিল॥

তটস্থ হইয়া রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসয়।
তবে তবে কেমনে কি নাম নিকশয়॥
পুনঃ রাণী কহে যবে অলস ত্যজিলা।
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা॥

রাজা তো বৃত্তান্ত শুনিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এত গোপন করিয়াও গোপনীয় বস্তু আর গোপন রাখিতে পারিলাম না। হিয়ার মাণিক বাহিরে প্রকাশ হইয়া গেল। এইজন্য রাজার আনন্দ না হইয়া বড়ই খেদ উপস্থিত হইল।

হাহাকার করি রাজা ভূমিতে পড়িলা।
হিয়া হৈতে রতন কি মোর বাহিরিলা॥
হাহা করি তৎক্ষণাতে পরাণ ত্যজিলা।
একি একি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিলা॥
হায় মুঞি এতদিন ইহা না জানিল।
স্বামী মোর হেন মহা-অনুভব ছিল॥
হৃদয়-পুটিকা মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥
বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ।
এই এক মোহান্তের ভাব অনুরূপ॥
তাহা না বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল জালিয়া॥

এইভাবে শিরে করাঘাত করিয়া ভক্তিমতী রাণী স্বামী-বিচ্ছেদের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাণী ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, এই আনন্দের ব্যাপারে হঠাৎ এইরূপ বজ্র নিপতিত হইবে। রাণীর

বিলাপ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দুইজনই তো শ্রীকৃষ্ণভক্ত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণভক্তের জন্য এক মহা ফাঁপরে পড়িলেন। রাণীর বিলাপ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ভগবানের প্রাণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল।

এইভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে।
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়িলেন ফান্দে ॥
দরশন দিয়া সুধাময় দৃষ্টি দিয়া।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া ॥
সম্মুখে দেখয়ে দেহে নবঘনশ্যাম।
বাঞ্ছিত রতন-নিধি মিলে অভিরাম ॥
প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্ন-সিংহাসনে।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে ॥
কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈলা অনুচর।
তাহা দোঁহা চরণেতে কোটী নমস্কার ॥

সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা হইলে কি-ই না হইতে পারে? ভগবানের সুধাময় দৃষ্টির ফলে মৃত রাজা প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ইচ্ছা করিলে তিনি জীবিতকেও মৃত করিতে পারেন, আবার মৃতকেও জীবন দিতে পারেন। যাহা হউক ভক্তিমতী রাণীর মনের বাসনা পূর্ণ হইল। নবঘনশ্যামের কৃপায় তাঁহার স্বামী বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। আনন্দের আর সীমা নাই। তখন উভয়ে মিলিয়া মনের আনন্দে ইষ্টদেবতার সেবা-পূজায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অন্তিমে উভয়ে গিয়া ইষ্টদেবতার নিত্য-সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করিয়া ধন্য হইলেন।

আমরা শুক্তি করি না, ভক্তি দেখাই ; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা এমন করিয়াই ভক্তির বস্তুকে অতি গোপনে রাখিয়া সাধন করিয়া চলেন। পরমহংসদেবেরও কথা আছে, সাধনা করিবে—মনে, বনে আর কোণে! একটু কিছু করিতে না করিতেই আমরা চাই নিজেদের জাহির করিতে,আমি যে ভক্ত—ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তাহা জগতে প্রচার করিতে। এই জন্যই ভক্তিদেবী আড়ম্বরের স্থান হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। প্রকৃত ভক্তের কাজ চলে গোপনে। শুধু এই দেশীয় ভক্তের মুখেই যে এইরূপ বাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহা নহে, বিদেশী ভক্ত-কবির মুখেও এইরূপ অনুভবের বাণী নিষ্কাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

ভক্ত-কবি বলিয়াছেন—

"Love is not love, that can be told
Gentle breeze blows silently, but invisibly."

প্রেমের মন্দাকিনীধারা অদৃশ্য ভাবেই মানব-জীবনে বহিয়া চলে। আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্রে প্রেম থাকে না। প্রেমের স্থান—অন্তরের মণি-কোঠায়। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়সম্পুটেই থাকে। ভক্তের উপাখ্যানে যেন আমরা সকলেই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করি। আমরা যে ভক্তি হইতে কত দূরে—ইহাতেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। অভিমান, অহঙ্কার, দম্ভ, পরশ্রীকাতরতা না গেলে কি আর প্রেম-ভক্তির দর্শন মেলে? শ্রীগুরুর-চরণে প্রার্থনা, আমরা সকলেই যেন যথার্থ প্রেম-ভক্তির অধিকারী হইতে পারি।

বৃন্দাবনের পুরুষ

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে সবই প্রকৃতি—পুরুষ বা পুরুষোত্তম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বৃন্দাবনে সমগ্র প্রকৃতিই শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগিণী। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস, প্রতিটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে বিভোর। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—মহাজনের এই অমৃত-পদাবলী বৃন্দাবনে যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই অখণ্ড প্রভাব। এই ধামে একচ্ছত্রাধিপত্য যিনি করিতেছেন, তিনি বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বৃন্দাবনের সাধনা প্রকৃতি-ভাবে—পুরুষোত্তমকে পাইবার জন্য, লাভ করিবার জন্য। সমগ্র প্রকৃতিই ধ্যানমগ্না—শুধু প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবার জন্য। বৃন্দাবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই—একমাত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া। সেখানে শ্রীকৃষ্ণই প্রাণীমাত্রের হৃদয়বিহারী। এই দিব্য অনুভূতিতে বিভোরা ছিলেন মীরাবাঈ। বৃন্দাবনে আসিয়া রূপগোস্বামীকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার নিকট প্রথম শুনিলেন এই ভাবের বিরুদ্ধ কথা। বৈষ্ণব-ভাবে-ভাবিতা ভগবদ্ভক্ত মীরাবাঈ গোস্বামীর দর্শন অভিলাষ করিয়া তাঁহার কাছে সমাচার পাঠাইলেন।

বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপগোস্বামী-দরশন॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কারো দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥

শ্রীরূপগোস্বামী তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অপ্রাকৃত ধামে ভজনে বিভোর। কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করেন না, অনুক্ষণ ভজন লইয়াই সমাহিত—অনুরক্ত। তার উপর বিরাগী সাধুর প্রকৃতি-সম্ভাষণ বা দর্শন তো একেবারেই নিষেধ। পুরুষ হইয়া তিনি একজন নারীর সঙ্গে কিরূপে সাক্ষাৎ করিবেন—ইহা যে সাধন-বিরুদ্ধ কথা! কিন্তু এই বিধি কি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? যিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত, নারী-পুরুষ ভেদজ্ঞান যাঁহার বিলুপ্ত, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিকেই যিনি আরাধিকা, সেবিকারূপে অনুভব করেন, তাঁহার কাছে আবার পুরুষ-নারীতে কি দ্বন্দ্ব? রূপগোস্বামীর ভাবকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য, কিম্বা গোস্বামীর ভাবেও যে সংশোধনের স্থান আছে ইহা দেখাইয়া দেওয়ার জন্যই যে বৃন্দাবনেশ্বর মীরাবাঈকে তাঁহার ধামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

রূপগোস্বামী সমাচার অবগত হইয়া বাঈজীকে বলিয়া পাঠাইলেন—

গোসাঞি কহেন মুঞি করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥

সর্ব্বদা ভজনে অনুরক্ত একজন বৈরাগী বৈষ্ণবের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মীরাবাঈ আশ্চর্য্যান্বিত এবং একটু ক্ষুব্ধও হইলেন। এ কি কথা বা অদ্ভুত কথা! বাঈজী মনে মনে ভাবিলেন, বৃন্দাবনে আবার দ্বিতীয় পুরুষ আছে নাকি? দেহ-ভেদ থাকিলেও বৃন্দাবনে তো সকলেই প্রকৃতি, সকলেই গোপী, সকলেই শ্রীরাধিকার অংশ। বৃন্দাবনে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব থাকিতে পারে—ইহা যে ভাবের ভাবিকা বাঈজী কল্পনায়ও স্থান দেন নাই। ইহা কি আশ্চর্য্য কথা!

এ কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুনঃ কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণবিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহো যে আইল তাথে নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারীজীর প্রিয় সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহো অন্তঃপুরস্থলে॥

কৃষ্ণ-অনুরাগে অনুরাগিণী মীরাবাঈ তাঁহার সংশয়ভঞ্জন করিবার জন্য পুনঃ গোস্বামীর কাছে বার্ত্তা পাঠাইলেন। বাঈজী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তবে কি আমার অন্তরের অনুভব মিথ্যা? আমি যাহা এত-দিন কল্পনা করিয়া আসিয়াছি তাহা অপেক্ষা কি গোস্বামীর অনুভবই সত্য? না, তাহা হইতে পারে না। গোস্বামীরও হয়ত বুঝিবার ভুল হইতে পারে। আমি তো বৃন্দাবনে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্বও কল্পনা করিতে পারি না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গিরীধারীলাল ছাড়া আর তো কেহ নাই। "মেরে তো গিরিধর গোপাল দুস্‌রা ন কোঈ"—বাঈজী এই ভাবে ভাবিতা হইয়াই গোস্বামীর কাছে পুনঃ সমাচার পাঠাইলেন। গোস্বামীজী দ্বিতীয়বার বাঈজীর দর্শন-লাভের অনুমতির কথা জ্ঞাত হইয়া একটু লজ্জিত হইলেন। তারপর—"এতদিন শুনি নাই,...আর কেহ পুরুষ আছে বৃন্দাবনে"—বাঈজীর এই চিরস্মরণীয় অপ্রাকৃত ভাবের উক্তি রূপগোস্বামীকে একটু বিচলিত করিয়া তুলিল। গোস্বামী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাই তো আমারই তো ভুল। বৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর তো দ্বিতীয় পুরুষ নাই। সমগ্র জগৎই যে

শ্রীরাধিকা, পুরুষও যে প্রকৃতি। প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। ভজন-অনুরক্ত শুদ্ধচিত্ত বৈষ্ণব-সাধকের প্রাণে তখন সেই দিব্যভাব ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ভুল বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া বাঈজীকে আসিতে অনুমতি দিলেন।

এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিঞা শ্রীরূপ তবে লজ্জিত হইলা॥
কহিতে কহিলা পুনঃ বাঈজীর স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে॥

এইবার আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধার কালমেঘ নাই—চিদাকাশ একেবারে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। গোস্বামীজী বাঈজীকে আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বাঈজীও বৈষ্ণব-শিরোমণি ভজনশীল ভক্তের অনুমতি পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দেরই তো কথা। কেন না দুইটী উন্নত হৃদয়ের দেখাদেখি, কৃষ্ণ-কথালাপে তো আনন্দ হওয়ারই কথা।

তবে বাঈ হৃষ্টমনে গোসাঞির স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে॥
পরম সুন্দরী বাঈ অলপ বয়েস।
গোপী উদ্দীপন রূপের হৈল প্রেমাবেশ॥
দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণকথা রসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ উল্লাসে।

অপ্রাকৃত ভাব-বিনিময়ে পরস্পরের আধার কৃষ্ণকথা-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মীরাবাঈ জগৎকে এক নূতন আদর্শের কথা শুনাইয়া

গেলেন। আজ পর্য্যন্ত এই ভাবের সাধনা চলিয়াছে। পুরুষ-দেহ লইয়া নারী-ভাবের সাধনা, প্রকৃতি-ভাবে সাধনা এখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ গতিতেই চলিয়া আসিয়াছে। নবদ্বীপের ললিতা সখী ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরুষত্বের বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরুষোত্তমের শরণ লওয়ার এই যে অমৃত-সঙ্কেত—ইহা বোধ হয় উজ্জ্বল করিয়া প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিলেন বৃন্দাবনে মীরাবাঈ। সাধন-জগতে মীরাবাঈএর এই দান চিরস্মরণীয়। রূপগোস্বামীর সাধনা অপূর্ণই থাকিয়া যাইত, যদি সেই অপ্রাকৃতধামের অধীশ্বর তাঁহার আদর্শ ভক্ত মীরাবাঈকে শ্রীবৃন্দাবনধামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া না আসিতেন। সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একজন প্রেমোন্মাদিনী ভক্তের মুখে অবগত হইল—বৃন্দাবনে একমাত্র কৃষ্ণ বিনে দ্বিতীয় পুরুষ নাই।

ভাবদেহ ভাবলোকে থাকিতে পারে; কিন্তু এই মর্ত্ত্যজগতে, এই ক্লেদ-কালিমামাখা সংসারে সেই দিব্যভাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ারই কথা। মীরাবাঈএর কথা স্মরণেও মনে দিব্যভাব জাগে। কতখানি উন্নত-স্তরের সাধিকা ছিলেন তিনি, যিনি রূপগোস্বামীর মত ভক্তকেও সংশোধন করিতে পারেন—ইহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয় না কি? আমরা পুরুষত্বের অভিমান লইয়া এই স্থূল জগতে কত নারীর উপরই না অকথ্য নির্য্যাতন করি; কিন্তু যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে, মাহেন্দ্র ক্ষণে আমাদের প্রাণে সেই দিব্য-ভাব জাগিয়া উঠে, পুরুষোত্তমের কৃপায় আসল পুরুষ বা একমাত্র পুরুষের সন্দর্শন ভাগ্যে ঘটে—তখন সব অভিমান-অহঙ্কার নিমেষে দূরী-ভূত হইয়া যাইবে। তখন পুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াই আসিবে প্রাণে অপরিসীম পরিতৃপ্তি। বৃথা পুরুষত্বের অভিমান লইয়া

নিরস শুষ্ক সাধনায় আর মনোনিবেশ করিতে তখন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা জাগিবে না। পুরুষ কে? আমরা তো প্রকৃতিরই ছায়া বা অংশ। পুরুষোত্তমকে সমগ্র প্রকৃতিই তো আরাধনা করে। বৃন্দাবন সেই অপ্রাকৃত ভাবেরই রাজ্য। ভাবের রাজ্যে স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ নাই; সেখানে ভাবেরই প্রাধান্য, দেহের কোন প্রশ্নই উঠে না। সব সেখানে কৃষ্ণরাগে অনুরঞ্জিত. সকলের হৃদয়বল্লভ যেখানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ—সেখানে দ্বন্দ্ব জাগিবেই বা কেমন করিয়া? অপ্রাকৃতধামের অধীশ্বর পুরুষোত্তমের কাছে এই আমার আকুল আবেদন বা আকূতি, ঠাকুর! দেহ-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া আমাকে ভাবের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। আমি যেন তোমার আরাধিকা শক্তির আশ্রয় পাই।

রাণী মদালসা ও অলর্কজী

টাকা-কড়ি এবং ভোগ-সুখ ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কিছুই কাম্য নাই, ইহা মস্ত বড় ভুল ধারণা। ভারতের নারীরা ত্যাগেরও বহু জলন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ী দেবী পার্থিব জগতের বিষয়বিভবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বামীর কাছে একদিন অমৃতত্বের দাবী করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহার অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে। কে বলে নারীর ত্যাগ নাই, নারীর মাঝে উৎসর্গের প্রেরণা নাই, নারী দেবী নয়, পরমেশ্বরী নয়? ভারতের আদর্শ নারীগণ ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, শিল্পে তাঁহাদের অভিনব শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের ক্ষেত্রে নারীর অবদান উপেক্ষণীয় ত নহেই, বরঞ্চ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইল—ভগবান্‌কে জানা; ইহা যেমন ভারতের সাধকবৃন্দের কথা তেমনি সাধিকারাও নিজেদের জীবনে বহুক্ষেত্রে তাহা সুপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের কাছে সংসার তুচ্ছ, আবার ভগবানের জন্য সংসার পরম সমাদরের বস্তু। ভারতবর্ষের কোন আশ্রমই ভগবানের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নহে। ভারতবাসী সর্ব্বক্ষেত্রে ভগবান্‌কে লইয়াই সংসার করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। আজ একটী আদর্শ মহিলার ত্যাগের বিষয়েই আলোচনা করিব। ভারতের নারীরা একদিন কোন্ সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহাই ইহাতে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মদালসা।
ভাগবত তেঁহো যাঁর সঙ্গ ভবনাশা॥

পর-উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা যাঁহার।
পরায় সভার গলে কৃষ্ণভক্তি হার॥
ক্রমে ক্রমে চারিপুত্র জন্মিল উদরে।
কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া সভায় তারে॥
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে পাঠাইয়া দেন বনে॥

রাণী মদালসা একে-একে চারিটি পুত্রকেই মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, বনে শ্রীকৃষ্ণভজন উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেদের একটু বড় করিয়াই রাণী মায়া-মমতায় আবদ্ধা না হইয়া পুত্র-গণকে সংশিক্ষা প্রদান করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত করিয়া দিলেন। ছেলেরা বড় হইয়া সংসারভোগে মত্ত হইয়া গতানুগতিক পন্থায় জীবন অতিবাহিত করুক, রাণী ইহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। রাণীর একান্ত বাসনা, তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের একটীও যেন ভগবদ্ভজনবিমুখী না হয়। এই-ভাবে কিছুদিন যায়, রাণীর পুনঃ একটী পুত্রসন্তান হইল। রাজা তো পুত্রমুখ দেখিয়া পরমানন্দিত। জন্মলগ্ন দেখিয়া এই পুত্র কালে বহু ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে অবগত হইয়া রাজা পুত্রের নাম 'ধনেশ' রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন। রাণীর কিন্তু এই নাম পছন্দ হইল না।

মনে ক্ষুব্ধ হয়্যা কিছু কহে মদালসা।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমার বড় দেখি আশা॥
পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি করিবে।
অভিমান ফল মাত্র পরিণাম যাবে॥

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা তো স্তম্ভিত! একে একে চারিটি পুত্রকেই বনে হরিভজনে পাঠাইয়া দিয়া রাণী নিশ্চিন্ত; কিন্তু রাজা মায়াধীন, তিনি

পুত্রশোকে অস্থির। রাণীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন—

যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে রাখহ॥
রাজা হইবার এক চাহি ত অবশ্য।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্যু॥

রাজার কথায় রাণী প্রসন্না না হইয়া বলিলেন—"ভাল, এ ছেলেকে খুব প্রীতির সহিত মানুষ কর, এ সন্তান রাজা হইয়া তোমাকে সুখী করিবে।" যাহা হউক, রাণী এই ছেলের নাম "অলর্ক" রাখিলেন। এইবার রাজা বেশ হুঁশিয়ার হইয়াছেন। ছেলে একটু বড় হইতেই রাজা আর ছেলেকে রাণীর কাছে যাইতে দেন না; কেননা বেশী মেলা-মেশার ফলে এই ছেলেও বা আবার ভগবদ্ভজন-উদ্দেশ্যে বনবাসী হয়! রাণীর মনে কিন্তু শান্তি নাই।

রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি॥
ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল॥
সোনার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া॥
পুত্রস্থানে দিল সেই সম্পুটরতন।
কহিলা রাখিবে অতি করিয়া যতন॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে॥

মহৎ বিপদ্ হৈতে উদ্ধার হইবে।
অন্য সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে॥

অলর্ক মাতৃপ্রদত্ত অমূল্য ধনকে অতি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। এদিকে রাজা ছেলে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, তাহাকে কাশীতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; পাছে মায়ের সঙ্গে থাকিলে শেষ পরিণামে চার পুত্রের মতই অবস্থা হয়। যাহা হউক, কালে রাজা-রাণী উভয়েরই মৃত্যু হইল। অলর্ক রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অলর্করাজার জ্যেষ্ঠ চারি ভাই বনে হরিভজনে লিপ্ত থাকিয়াও ছোট ভাই অলর্কের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেহই সংসার-চক্রে নিপতিত হন নাই, আর ছোটভাই এই সংসার-মায়ায় আবদ্ধ হইয়া হরিভজনবিমুখ হইয়া থাকিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে এক উপায় স্থিরীকৃত হইল। তাঁহারা অলর্কের প্রতিযোগী রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাঁহাদেরও অধিকার আছে এই দাবী জানাইলেন। প্রতিযোগী রাজার সুবিধাই হইল। তিনি প্রথমে রাজা অলর্কের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তাহার আরও চারটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, তাঁহারাই রাজা হওয়ার অধিকারী। বড় থাকিতে, কনিষ্ঠ কেন রাজা হইবে?

অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া।
কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা করিয়া॥
তবে যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা।
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা॥
সেইকালে মাতাদত্ত সোনার পুটিকা।
মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা॥

মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে।
খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে॥
অতএব এই ঘোর বিপদ-সময়।
এইকালে সেই কৌটা খুলিতে যুয়ায়॥

রাজা রত্নপুটিকা খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ বাণী রহিয়াছে। বড় সুন্দর উপদেশ।

অতএব শুভ নিশি প্রভাত হইল।
খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্য্যার্থ্য।
ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর যুক্তি তর্ক ব্যর্থ॥

পড়িতে পড়িতে রাজার মনে বিবেকের উদয় হইল। অলর্কজী তৎক্ষণাৎ কৌপীন পরিধান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী চার ভাইকে অক্লেশে রাজ্যের অধিকারী হইতে আবেদন জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন-উদ্দেশ্যে বনে চলিয়া গেলেন। চারিভাই যখন শুনিতে পাইলেন যে, রাজা অলর্কজী হরিভজন-উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিযোগী রাজার কাছে তাঁহাদের আসল মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

আমাদিগের রাজ্যহেতু তাৎপর্য্য নহে।
ভ্রাতা অলর্ক মোহ-অন্ধকূপে রহে॥
তাহার উদ্ধারহেতু ভূমিকা করিনু।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু॥
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা।
তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা॥

এই বলিয়া চারিটি ভাই কৌপীন-কমণ্ডলু লইয়া আনন্দিত মনে সেখান হইতে বিদায় হইয়া যথাস্থানে উপনীত হইলেন।

যাইয়া মিলিল যথা আছে অলর্ক ভাই।
পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই॥

ধন্য রাণী মদালসা, যাঁহার শিক্ষায় একে একে পাঁচটি সন্তানই ভগবদ্-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের আদর্শ নারী-চরিত্রের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এইখানে ফুটিয়া উঠে নাই কি? মায়েদের পক্ষে, বুকের ধনকে এইভাবে ভগবদ্ভজনের জন্য পরিত্যাগ, আজকাল অস্বাভাবিক হইয়া পড়িলেও, একদিন এই ভারতের এই মাটিতেই, এই-রূপ মা অনায়াসে জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেন। ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের উন্মাদনা শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া নহে; এই বিষয়ে মায়েদেরও যথেষ্ট অবদান আছে। কবে আবার ভারতের সেই শুভদিন ফিরিয়া আসিবে, যেদিন গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল কাজের সঙ্গেই ভাগবত-ভাব সম্মিশ্রিত হইয়া আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হইবে। ভগবান্‌কে পুত্ররূপে কামনা করিয়া, পুনঃ ভগবদ্ভজনের জন্য পুত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া, পুত্রকে সংসারত্যাগী হইবার প্রেরণা দিয়া আবার রাণী মদালসার মত কবে মাতৃজাতি উদ্বুদ্ধা হইবেন? সকলে সংসারত্যাগী না হইলেও, এই সংসারই আবার কবে ভগবানের সংসারে পরিণত হইবে? ভারতের দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ একদিন কত উচ্চেই না প্রতিষ্ঠিত ছিল! মায়েরাও একদিন কত ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা আবার সেই শুভদিনের প্রতীক্ষাই করিতেছি এবং মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে এই প্রার্থনাই করিতেছি, এই ভারতে যেন পুনঃ আদর্শ সাধিকা জননীর উদ্ভব হয়।

গুরুভক্ত বৈষ্ণব

ভক্তি গুরুসেবানৈপুণ্যে এবং নিষ্ঠাতেই ফুটিয়া উঠে। ভক্তি ভিতরে দেখা দিলেই সঙ্গে-সঙ্গে আসিবে অনুকূল ভজন বা সেবার প্রবৃত্তি। ভগবানের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি শ্রীগুরুতে যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের ঈশ্বর বা ভগবানেও ভক্তি নাই। ভক্ত মুক্তি-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জল ছাড়া যেমন মীন বাঁচে না, গুরুসেবা ছাড়াও গুরুভক্ত তেমনি প্রাণধারণ করিতে পারেন না। সেবাই ভক্তজীবনের সিদ্ধি এবং সাধনা। কাম, ক্রোধ, লোভ—এমন কি মুক্তির পিপাসা পর্য্যন্ত ভক্ত ত্যাগ করিতে সক্ষম; কিন্তু সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ভক্ত আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভক্তের কাছে গুরুসেবা মুক্তি-মোক্ষেরও উপরে। অবশ্য সেবারও অনেক স্তর বা বিভাগ আছে। গুরু, শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়াই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন—ভক্তির এই নয়টি অঙ্গ আদর্শ ভক্তগণদ্বারাই পরিকীর্ত্তিত। একসঙ্গে যে ভাগ্যবান্ ভক্ত এই নয়টিরই সেবা করিতে পারেন, তাঁহার তো ভাগ্যের সীমাই নাই। সবগুলি না পারিলেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও ভক্তির যে কোন অঙ্গ যাজনেও ভক্তের জীবন ক্রমশঃ উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। রূপগোস্বামী-সংগৃহীত 'পদ্যাবলী'র মধ্যে এই জাতীয় একটি শ্লোক আছে, যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

অধ্যাত্ম-পথে গুরুর স্থান সর্ব্বোচ্চে। গুরুকে কখনও মানুষ মনে করিতে নাই। ভগবানেরই সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি গুরু। গুরুতত্ত্ব সকল তত্ত্বের বা তর্ক-সমালোচনার উর্দ্ধে। শিষ্যের জীবন গুরু-সেবাদ্বারাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। ভগবৎ-বোধে শ্রীগুরুসেবাতে মানব-জীবন পূর্ণতা লাভ করে—ইহাই শাস্ত্রেরই কথা। প্রাণকে অস্বীকার করিলে যেমন মৃত্যু অনিবার্য্য, তেমনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলয় শ্রীগুরুতত্ত্বকে অবজ্ঞা করিলেও পতন অনিবার্য্য। অধ্যাত্ম-রাজ্যে শ্রীগুরুতত্ত্বই সর্ব্বগরিষ্ঠ তত্ত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভক্তের জীবনে—সেবাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ভক্ত গুরু-সেবা করিতে পারিলেই ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ। গুরুভক্ত এক বৈষ্ণবের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে আজ এখানে বর্ণনা করিতেছি।

একজন গুরু বহু বৈষ্ণব ভক্ত লইয়া গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। পুণ্যতোয়া সুরধুনীতটে বৈষ্ণবদের নামকীর্ত্তনে ভক্তিগঙ্গারও সমাগম হইত। একদিন কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে গুরুদেব গ্রামান্তরে চলিলেন। বৈষ্ণব গুরুভক্তটীও গুরুর সঙ্গে চলিতে উদ্যত। ইহা দেখিয়া গুরুদেব বৈষ্ণব-ভক্তটীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে গুরুগতপ্রাণ বৈষ্ণব-ভক্ত পরম ব্যথিত হইয়া বলিলেন—

শ্রীচরণসেবা মোর একান্ত নিয়ম।
কেমতে রহিব তাতে করিয়া বিরাম ॥

গুরুদেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি অল্পদিনের ভিতরই ফিরিয়া আসিতেছি। তুমি **গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীর** সেবায় আত্মনিয়োগ কর। জাহ্নবীর সেবা করিলেই গুরুর সেবা করা হইবে।

ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল।
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল॥
গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল।
নানা মত সেবা-ভক্তি করিতে লাগিল॥
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে।
বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কূপনীরে॥

বৈষ্ণবভক্তের এইরূপ আচরণ দেখিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবগণ একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপই করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তবে কি যত লোক গঙ্গাস্নান করে, তাহারা সকলেই নরকে যাইবে ?" ইত্যাদি। অন্যের ঠাট্টা-বিদ্রূপে গুরুভক্ত বৈষ্ণবের মন কিন্তু একটুকুও বিচলিত হইল না। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, গুরুর স্বরূপ গঙ্গার সেবা করিয়া গুরুভক্ত বৈষ্ণব পরম আহ্লাদে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অল্প কয়েকদিন পরেই গুরুদেব ভজন-কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবামাত্রই অন্যান্য ভক্তগণ গুরুদেবের কাছে বৈষ্ণবভক্তের আচরণ-সম্পর্কে নালিশ করিলেন। গুরুদেব সব কথা শুনিয়া—

সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা।
এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈলা॥
আর যে ঞিহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া।
ঈর্ষা করি নিন্দে কিন্তু দিব জানাইয়া॥

এইরূপ ভাবিয়া গুরুদেব সকল শিষ্য-সমভিব্যাহারে একদিন গঙ্গাস্নানে চলিলেন ; সঙ্গে শত শত শিষ্য। গুরুদেব গভীর গঙ্গায় নামিয়া অবগাহন স্নান করিতে করিতে সেই গুরুভক্ত বৈষ্ণবটীকে গামছা দিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। ভক্তটী তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। গঙ্গা যে গুরুর সাক্ষাৎ-স্বরূপ ইহাও গুরুরই আদেশ, আবার গামছা দিয়া আসাও গুরুরই আদেশ। এখন গুরুভক্ত কোন্ আদেশ পালন করেন? যাহা হউক, গুরু-আজ্ঞা বলবান্ মনে করিয়া গুরুভক্ত বৈষ্ণব যেই গঙ্গাজলে পাদ অর্পণ করিলেন অমনি—

গুরু-গঙ্গা কৃপাবলে দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেইখানে পাদতলে কমল ফুটয়॥
প্রতি পাদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিলা।
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা॥
জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর।
বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর॥

গুরুভক্ত বৈষ্ণবের অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক্। পারে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবগণ ভাবিতে লাগিলেন, আমরা কি মহা অপরাধী! যথার্থ গুরুকৃপা এই বৈষ্ণবভক্তটীই লাভ করিতে পারিয়াছেন, আমরা মাত্র অহঙ্কারের বোঝাই বহন করিতেছি। বৈষ্ণবগণ স্তব্ধ-বিস্মিত হইয়া পারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী।
এ কি অদভূত এই সাধু কে না জানি॥

ঞিঁহার চরণে কত কৈনু অপরাধ।
নিন্দিনু বিদ্রূপ কৈনু করিনু বিবাদ॥
ঞিঁহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়।
তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়॥
এত কহি তাঁহার চরণে সভে ধরে।
অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি-নতি করে॥

বিনয়ের অবতার বৈষ্ণব-ভক্তটী অন্যান্য ভক্তের এইরূপ আচরণে কুণ্ঠিত হইয়া, করযোড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে বারণ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব ভক্তটীর প্রণাম নিতে কত কুণ্ঠা। গুরুদেব তখন সকল বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

গুরু অনুযোগ কৈলা সব শিষ্যগণে।
বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে॥
উত্তম-মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি।
আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণদোষ সঁপি॥

এইভাবে স্বয়ং গুরুদেবই ভক্তের পরিচয় সর্ব্বসমক্ষে প্রদান করিলেন। ভক্তের মধ্যেও যে অধম-উত্তম এই শ্রেণী বিভাগ আছে, অভিমানে অন্যান্য ভক্তগণ এই আসল কথাটীই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভক্ত ছাড়া ভক্তমাহাত্ম্য কে বুঝিবে? অভিমান যেখানে, সেখানে গুরুভক্তির স্থানই যে নাই। অভিমানশূন্য হৃদয়েই গুরুভক্তি দেখা দেয়। গুরুর আদেশে ভক্ত সবই করিতে পারে; কেন না গুরুর আজ্ঞার উপর আর বিচারের স্থান নাই; কিন্তু অভিমানবশতঃ ভক্ত যাহা করে, তাহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতি। অন্যান্য বৈষ্ণব-ভক্তদের চৈতন্যসঞ্চারের জন্যই গুরুদেব এই শিক্ষা দিলেন। ভক্ত হইলেই সকলের সমান অধিকার হয়

না; উত্তম, মধ্যম এবং অধম অধিকারী-বিচার আছে। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে আছে—তর, তম। অভিমান আসিলেই, শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিয়া একাকার করিবার দুষ্প্রবৃত্তি প্রাকৃত-ভক্তের মনে জাগ্রত হয়। গুরু আঘাত দিয়া দর্প চূর্ণ করিয়া সেই সব ভক্তের চৈতন্য সঞ্চার করেন।

গুরুভক্ত বৈষ্ণবের সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে আমরা কয়েকটি দুর্ল্লভ সম্পদ গ্রহণ করিতে পারি। সেবানিষ্ঠা, গুরুবাক্যে অচল-অটল বিশ্বাস এবং বিনয়ই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। গঙ্গা গুরুরই স্বরূপ, যে মুহূর্ত্তে বৈষ্ণব-ভক্ত গুরুমুখ হইতে এই আদেশ পাইলেন, কায়মনোপ্রাণে সেই আদেশকে গ্রহণ করিলেন। মা গঙ্গা স্বীয় বক্ষে কমল প্রস্ফুটিত করিয়া জগতে ভক্ত-মাহাত্ম্য এবং গুরুবাক্যনিষ্ঠার অপূর্ব্ব ফলই প্রকট করিয়া দেখাইলেন। এত দেখিয়া শুনিয়াও কি আমাদের চৈতন্যসঞ্চার হইবে না? গুরু যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলেন, উত্তম মধ্যম অধম ভক্ত বলিয়া যাহাদের পরিচয় দিলেন, তাঁহার এই আদেশকে অবমাননা করে যে, সে কি ভক্ত, না অভক্ত? পরম ভক্ত বরিশালনিবাসী ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগে পড়িয়াছিলাম - "লোকের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা অহঙ্কারীর একটী প্রধান লক্ষণ।" অহঙ্কারী হওয়াতে কি সুখ-শান্তি লাভ হয়, না অহঙ্কার-বিসর্জ্জনেই সুখ-শান্তি আসে? ভক্ত হওয়া আমাদের কাম্য, না অহঙ্কারী হওয়া? গুরুপ্রদত্ত নির্দ্দেশ বা অধিকারকে যাহারা অক্লেশে অবজ্ঞা করিতে পারে—তাহারা কি ভক্ত-নামের যোগ্য? গুরুভক্ত বৈষ্ণবের জীবন-কাহিনী হইতে ভক্তের আচরণ এবং গুরুর চৈতন্যসঞ্চারী শিক্ষা যেন আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি।

রাগমার্গে ভজন

ভজনের দ্বিবিধ পথ, যথা—রাগমার্গ ও বৈধীমার্গ। রাগমার্গে বিধি-নিষেধের কোন বালাই নাই, প্রাণ যাহা চায় রাগমার্গে তাহারই সমর্থন আছে। বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি যত বৈধীমার্গে। রাগানুগা ভক্তি বা প্রেম দ্বারা ভগবানকে কিরূপ সহজে লাভ করা যায় ব্রজগোপীগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাণের টান বড় টান। এই টানের কাছে সকল শক্তি পরাজিত। তাই রাগমার্গে ভজন আরম্ভ করিলে ভগবান তখন কাছে না আসিয়া, ভক্তকে দর্শন দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। রাগমার্গের ভজনই শ্রেষ্ঠ ভজন। এই ভজন-পথে ভগবান্ সাধকের নিকট পরমাত্মীয়রূপে প্রতিভাত হন। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের তখন একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অভিলাষ-অনুযায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাগমার্গের সাধক-সাধিকা অতি সহজে ইষ্টলাভ করিয়া থাকেন। প্রাণ হইতে রাগমার্গের বা ভাবের অঙ্কুর উৎপন্ন না হইলে এই পথে অভিনয় করা চলে না। জন্মজন্মের সাধনার ফলে সাধক-প্রাণে রাগমার্গ-অনুসরণের প্রবল পিপাসা দেখা দেয়। আমরা অনেক সময়ই ভাবিয়া থাকি, বিধি-নিষেধ পালন করিলেই বুঝি ভগবান্‌লাভ সহজ হইবে, কিন্তু ভগবান্ যে বিধি-নিষেধের বাহিরে—এই কথা একবারও চিন্তা করি না। তাঁহাকে যে কি প্রকারে সহজে লাভ করা যায় তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা ঠিক, প্রাণের টানে তাঁহাকে ডাকিতে না পারিলে তিনি সহজে সাধক-সম্মুখে আসেন না। যাহা করিতে হইবে তাহাতে প্রাণ মিশানো

থাকা চাই। প্রাণের টানে অনেক সময়ই বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য থাকে না. এই জন্য যে সাধক অভীষ্টলাভ হইতে বঞ্চিত হন তাহা নহে। বরঞ্চ রাগমার্গে শীঘ্র সুফল ফলে। আজ আমরা এক রাগমার্গের সাধিকার কথাই এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মাড়োয়ার দেশীয় জগন্নাথ-ভক্ত।
করমাবাঈ নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে।
করমাবাঈর খিচুড়ি যে অদ্যাপি বিদিতে॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
হরিভক্ত সাধুগণ শ্রবণ-রঞ্জন॥

মাড়োয়ার দেশে করমাবাঈ নামে একজন উন্নত-স্তরের সাধিকা ছিলেন। তাঁহার ভজন ছিল রাগমার্গের ভজন। বিধি-নিষেধ কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। ভগবান্‌কে মনে করিতেন তাঁহার অতি আপনজন, আদরের মাণিক। ভগবান্‌কে ডাকিতে হইলে গঙ্গায় স্নান করিতে হইবে, বহু মূল্যের অলঙ্কার পরিধান করিতে হইবে, তাঁহার ভোগ-রাগ দিতে হইলে শুচি-শুদ্ধ হইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে—এত সব বিধি নিষেধের ধার করমাবাঈ ধারিতেনই না। তিনি চলিতেন তাঁহার প্রাণ যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, অন্তরাত্মা যাহাতে প্রীতিলাভ করে—সেই পথে।

বাঈজী প্রভাতে উঠি না ধুইয়া মুখ।
খেচরান্ন পাক করে মনে বড় সুখ॥
আদরক মরিচ হিং বহু ঘৃত দিয়া।
রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিঞা॥

চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি।
ভোগ লাগাইয়া বাঈ আনন্দ আকুলি॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন।
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি হন॥

গৃহস্থের সংসারে যেমন দেখা যায়, ছেলে-পিলেদের জন্য অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মা স্নান না করিয়া এবং কাপড় না ছাড়িয়াই সিদ্ধভাত রান্না করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া তবে অন্য কাজে হাত দেন, করমাবাঈএর ভজনরীতিও ছিল তদ্রূপ। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করিতেন, বেলা করিয়া খাইতে দিলে ভগবানেরও কষ্ট হইবে। তাই বাসী কাপড়েই খিচুড়ি রান্না করিয়া জগন্নাথকে ভোগ দিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তিনি আচার-নিয়মের প্রতি তত লক্ষ্য করিতেন না। করমা বাঈএর ভজনের রীতি ছিল এইরূপ প্রচলিত আচার-বিরুদ্ধ। সাধারণ লোকের অনেক সময়ই এইরূপ আচরণ দেখিয়া মনে কিন্তু সন্দেহ জাগিবারই কথা; কিন্তু রাগমার্গের সাধিকা চলেন সম্পূর্ণ নিজের প্রাণের আবেগে; অন্যে কি বলিবে, কি সমালোচনা করিবে, তাহার প্রতি রাগমার্গের সাধক-সাধিকার কোন ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া।
অতিথি হইলা শুভ চরিত্র জানিঞা।
রতি প্রেম সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিলা।
কিন্তু এক রীত দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা॥
স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়।
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি না জন্ময়॥

আচারপরায়ণ বৈরাগী সাধকের চক্ষে করমাবাঈএর এইরূপ আচরণ বিসদৃশ লাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য দিকে করমাবাঈএর চরিত্রে দুর্লভ রতি-প্রেম দেখিয়া তাহার এই সামান্য অনাচারের ভাব যাহাতে সংশোধিত হইয়া যায় তজ্জন্য বৈরাগী সাধক করমাবাঈকে কিছু উপদেশ দিতে মনস্থ করিলেন।

এতো ভাবি বাঈজীকে কহে কিছু নীত।
আচারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবা যে উচিত॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখ প্রক্ষালন স্নান।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবেদন॥
করহ নতুবা অপরাধ যে জন্ময়।
ভোজনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি নাহি হয়॥

ঠাকুরভোগ বা কৃষ্ণসেবার কাজ করিতে শুদ্ধ-পবিত্র হইয়াই করা উচিত। বৈষ্ণবসাধক সেই ভাবেই করমাবাঈকে উপদেশ দিলেন। অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারিণী সাধিকা করমাবাঈ বৈষ্ণব-সাধকের উপদেশকে অবহেলা করিলেন না। ভাবিলেন, গুরুজনের উপদেশ হয়ত এই ভাবে চলিলে তাহার পরম আদরের ধনকে আরও নিবিড়ভাবেই তিনি কাছে পাইবেন।

এতো শুনি করমাবাঈজীউ ঠাকুরাণী।
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি॥
সেই মত আচার করিয়া ভোগ দিব।
স্ত্রীজাতি মুঞি নাহি জানি কি করিব॥

করমাবাঈ নিজের দোষ স্বীকার করিয়া এখন হইতে সংশোধনের পথে চলিবেন বলিয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির অজ্ঞতা

স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। সাধু-সজ্জনের উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে তাহাতে আরও ভাল বা মঙ্গলই হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। সেইজন্য—

পরদিন সেই মত আচার করিল।
ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চড়িল॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথে খাওয়াইতে।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিতে॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেষে॥
আচমন না করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া।
কোন্ ভাগ্যবান্-গৃহে চরণ অর্পিয়া॥
সফল করিলে কার মানব-জনমে।
বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥

পরদিন করমাবাঈ আচারনিষ্ঠার সহিত ভোগ পাক করিয়া জগন্নাথকে তাহা নিবেদন করিলেন। কিন্তু বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় বাঈজীর মনে তাহাতে বড় সুখ হইল না। কিন্তু কি করেন, সাধু বৈরাগীর উপদেশ অবহেলাও করা চলে না। এ দিকে কিন্তু আর এক ব্যাপার ঘটিল। করমাবাঈ প্রীতি-ভক্তির সহিত যখন ভগবান্‌কে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করিলেন—ভগবান্ আসিয়া তখন সেই ভোগ গ্রহণ করিতে

বসিলেন। হাতে তুলিয়া খিচুড়ি মুখে দিয়াছেন এমন সময় শ্রীমন্দিরে দ্বিপ্রহরের জগন্নাথের ভোগের সময় হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া আর এক ভক্তের ডাকে তখন তিনি তথায় ছুটিয়া গেলেন। এইরূপ দোটানায় পড়িয়া ভগবান্ নিবেদিত ভোগ কোথায়ও তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিতে পারিলেন না। বৈধীমার্গের সাধক-বৈষ্ণবের উপদেশে এক মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ভগবান্ দেখিলেন ইহাতে নিজেরই মুশকিল, নিজেরই অসুবিধা ; তাই পরদিন জগন্নাথ প্রভু তাঁহার সেবক-গণের প্রতি এক আদেশ করিলেন।

তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
নিত্য মুঞি যাই করমাবাঈএর সদনে ॥
অপূর্ব্ব খিচুড়ি করি প্রণয় পূর্ব্বক।
খাওয়ায় আমারে তাহে বড় পাই সুখ ॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া।
অমুক বৈরাগী গিয়া কু-যুকতি দিয়া ॥
নীত শিখাইল তারে আচার করিতে।
যেহেতু বাঢ়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাথে ॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে।
প্রস্তুত সময় যাইতে হয় সেইখানে ॥
সেখানে সুস্বাদু আর বাঈয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে ॥
সেথা-হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তাঁর কাজ নাহি আচারেতে ॥

পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুঞি প্রীত॥

বৈরাগী সাধকের উপদেশপ্রাপ্তির পূর্ব্বে করমাবাঈ নিজের অভিরুচি অনুযায়ীই জগন্নাথের ভোগ লাগাইতেন। সকালে খাইয়া খাইয়া ভগবান্ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন মুশকিল লাগিয়া গিয়াছে তাঁহারই বেশী, আর ভক্তপ্রাণ ভগবান্ ভক্তের মনোব্যথা দূর না করিয়াই বা থাকেন কেমন করিয়া? তাই ভগবান্‌কেই প্রত্যাদেশ দিতে হইল। তাহার সুব্যবস্থা তাঁহার নিজেকেই করিতে হইল। করমাবাঈ নিজেও এইরূপ অসময়ে ভোগ দিয়া প্রাণে তৃপ্তি অনুভব করিতেন না। আচার-বিচারের কষ্ট ভগবানের সহ্য হইতে পারে; কিন্তু করমাবাঈএর নিকট ভগবান্ যে আচার-বিচারের বস্তু নহেন। ভগবান্‌কে করমাবাঈ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। করমাবাঈএর ভগবান্ সচেতন—অনুকম্পাপরায়ণ। ভগবান্ তাঁহার নিকট ইট-পাথর বা কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তু ছিল না। তিনি মনে করিতেন, অসময়ে ভোগ দিলে মানুষের মতই ভগবানকেও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হয়। ইহাতে তাঁহাকে কষ্টই দেওয়া হয়। সুতরাং আচার-বিচার করিয়া কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা ভগবান্‌কে প্রীত-তৃপ্ত করাই হইল আসল লক্ষ্য। ভগবান্ ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

প্রভুর আদেশ শুনি তটস্থ হইল।
বাঈজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥

পাণ্ডা সেবকগণের মুখে ভগবদাদেশ শ্রবণ করিয়া করমাবাঈ অতীব আনন্দিতা হইলেন। শ্রবণমাত্রেই তাঁহার শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পরদিন করমাবাঈ পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠিয়া খেচরান্ন পাক করিয়া জগন্নাথকে প্রেমানন্দভরে ভোগ দিলেন। জগন্নাথদেবও

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভক্তের নিবেদিত ভোগ পরিতৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ করিলেন।

ভগবানের আদেশ বৈরাগী-সাধকের কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তখন তাঁহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বাঈজীর নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—

তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয়।

* *

অতএব আছয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলন।

করমাবাঈএর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্মজীবনে বৈষ্ণব-সাধকেরও এক নূতন অনুভূতি লাভ হইল। আচারপরায়ণ সাধক বুঝিলেন—ভগবান্ শুধু আচার-বিচারেই সন্তুষ্ট নহেন। ভগবান্ দেখেন ভক্তের প্রাণ—হৃদয়। রাগমার্গের সাধকের নিকট বৈধীমার্গের সাধক এক নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া নিজের জীবন ধন্য মনে করিয়া পুনঃ সাধননিরত হইলেন।

রাগমার্গের সাধনা অতি উচ্চাঙ্গের সাধনা। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহারা অচিরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভের অধিকারী হন। কপটতা দূর করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের উপদেশ লইয়া রাগমার্গের ভজন করিতে পারিলে, ইহা অপেক্ষা ধন্য কৃতার্থ হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই।

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

ভগবদ্বাক্য—অব্যর্থ সত্য ; সুতরাং তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত দৈবীবাণী যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে—সেই শাস্ত্রও অভ্রান্ত এবং সত্য। সংশয় করিয়া, সন্দেহ করিয়া অনেক সময় আমরাও ভগবদ্বাক্যে ভুল ধরিতে দুঃসাহস করিয়া থাকি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভগবান্ কৃপা করিয়া ভ্রান্ত জীবের ভুল স্বয়ং আসিয়া অপনোদন করিয়া দিয়া যান। আজ আমরা ভগবানের সেই অপূর্ব্ব মহিমারই একটী কাহিনী বিবৃত করিব।

অনেক দিনের কথা, অর্জ্জুন মিশ্র নামে একজন পরম ভাগবত সাধু ব্যক্তি তাঁহার পত্নীসমভিব্যাহারে শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে, উদার চরিত্রে, নির্ম্মৎসর ভাবে এবং শান্ত-শিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীমদ্গীতা-ভাগবত পাঠ এবং আলোচনা লইয়াই তদ্গতচিত্তে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। সামান্য ভিক্ষান্নদ্বারা উদর পরিতুষ্ট করিয়া স্বামী-স্ত্রী পরমানন্দেই কালাতিপাত করিতেন। যাঁহারা যথার্থই ত্যাগী, তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রচুর আয়োজন-আড়ম্বরের কোনই প্রয়োজন করে না। জীর্ণ পর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজন করিয়াও তাঁহারা যেমন শান্তিতে থাকেন, রাজা-বাদশাহও তেমন নির্ম্মল মানসিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। ত্যাগের অপূর্ব্ব মহিমা ; ত্যাগ মানুষকে স্বল্পেই তুষ্ট করে। অসংযত কামনা দ্বারা নিজের অভাব নিজেই সৃষ্টি করিয়া ত্যাগী কোনদিন অশান্তির অনলে পুড়িয়া দগ্ধ হন না। অর্জ্জুন মিশ্রের স্ত্রীও যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার

চরিত্রেও অসাধারণ ত্যাগের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই বাহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে হেয় মনে করিয়া তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তার দরুন সানন্দচিত্তে দুঃখ-কষ্টকেই অকাতরে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ভিতরের অব্যাহত শান্তির দরুন অভাব-অভিযোগ আদর্শ স্বামী-স্ত্রীকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। পুরুষোত্তমের কৃপায় বেশ শান্তিতেই তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্র গীতার টীকা রচনা করিতে করিতে একটী শ্লোক লইয়া বড়ই গণ্ডগোলে পড়িয়া গেলেন। শ্লোকটী যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—৯।২২ শ্লোক

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—এই অংশটুকু পড়িয়া পণ্ডিত মিশ্রের মনে বেশ একটু সন্দেহের উদ্রেক হইল। ভগবান্ নিজে অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন—ইহা বোধ হয় ঠিক নয়, আর ঠিক হইলেও প্রকাশ্যে নয়; পরোক্ষে থাকিয়াই ভক্তের জন্য তিনি হয়ত সব যোগান—মনে মনে তাঁহার এইরূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে।
যোগক্ষেম বহিয়া যে অনন্য-ভক্তেরে॥
আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—ইহা অসম্ভব মনে করিয়া পণ্ডিতপ্রবর সেই স্থলে অন্য পাঠ বসাইয়া দিলেন। সংশয় এমনই মারাত্মক যে—সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে, তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত

হয় না। সংশয়ী ভগবদ্বাক্যেও অনাস্থা স্থাপন করে। নিজের যুক্তি-বিচারদ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে সক্ষম না হইলেই, সংশয়ী মানুষ মনে করে শাস্ত্রবাক্য—ভগবদ্বাক্য সবই মিথ্যা। সংশয়ের ঘোর অন্ধকারে যখন মানব নিপতিত হয়, তখন মানুষের এই কথাটা স্মরণ থাকে না যে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমত্তা যাঁহার মাঝে রহিয়াছে, তিনি যে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।" সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ভগবান্ অভেদ। গীতার অবমাননা করিলে ভগবানেরই অবমাননা করা হয়। পণ্ডিত মিশ্র গীতার শ্লোক কর্ত্তন করাতে স্বয়ং ভগবানেরই বুকে আঁচড় পড়িল।

গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে॥

আজকাল অনেক বিজ্ঞ-পণ্ডিত ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম না হইয়া, যেখানে-সেখানে মনোমত একটা পাঠান্তর সংযোগ করিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ভগদ্বাক্যের ভুল ধরিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান্ তাঁহার আসুরিক ভাবাপন্ন সন্তানের এইরূপ কত ধৃষ্টতাই না নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়াছেন! আমাদের উল্লম্ফনে, প্রশান্ত-সাগরের ন্যায় তাঁহার উদার গম্ভীর হৃদয় কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। অন্যায় করিলেও তিনি সতত আমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যাকুল। ভগবান্ দেখিলেন, অর্জ্জুন মিশ্রের ন্যায় একজন বিখ্যাত ভাগবত, পণ্ডিত যদি গীতার শ্লোক পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে ভগবানাপেক্ষাও তাঁহার বাক্যই অজ্ঞানান্ধ মানব অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মানিবে। সুতরাং এই

স্থলে পণ্ডিতেরই ভ্রান্তি নিরসন করিয়া জগতের লোককে গীতার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্ধিগ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে মানব-চিত্তে সংশয় জাগান যিনি, সংশয়ের নিরসনও করেন তিনিই। ইহাই তাঁহার চিরন্তন লীলা—লোকশিক্ষা।

যাহা হউক অর্জ্জুন মিশ্রের সংশয়-ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণবালকরূপে মিশ্র-গৃহে উপনীত হইলেন।

জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছু ভঙ্গি।
আচম্বিতে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পর দিনে গেলা পুনঃ ভিক্ষা অভিলাষে॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ-বলরাম।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম॥
দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার॥
যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
এতেক প্রসাদ তেঁহো পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥
সে যা হউক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা।

পণ্ডিত মিশ্র তখন ভিক্ষা-অভিলাষে বাহিরে গিয়াছেন। ঝড়বৃষ্টিতে কয়দিন ঘরের বাহির হইতে পারেন নাই—আর কয়দিনই বা মানুষ উপবাসী থাকিতে পারে? এদিকে ইতিমধ্যে ভগবান্ জগন্নাথ বলরাম

ব্রাহ্মণবালকের সাজে মিশ্র-গৃহে আসিয়া উপস্থিত। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই এইভাবে দুইজনের আগমন। প্রসাদের ভারে দুইজনের স্কন্ধই যেন নুইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত মিশ্র তো বাহিরে ভিক্ষান্নের জন্য গিয়াছেন, কিন্তু মিশ্রপত্নী ঘরেই বিরাজমানা। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখেন দুইটী পরম সুন্দর বালক। স্কন্ধে গুরুভার—অঙ্গ হইতে রক্তমোক্ষণ হইতেছে। মায়ের প্রাণ স্বাভাবিকই কোমল—এই দৃশ্য দেখিয়া মিশ্রপত্নী আরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বালকদুইটীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—কে এমন নিষ্ঠুর গো যে তোমাদের স্কন্ধে এত গুরুভার তুলিয়া দিয়াছে? ছেলে দুইটী প্রত্যুত্তরে বলিল—মিশ্রঠাকুর। মিশ্রপত্নী তো এই কথা শুনিয়া অবাক্, এত প্রসাদ মিশ্রঠাকুর কোথায়ই বা পাইলেন, আর যদিই বা পাইয়াছিলেন, এরূপ দুইটী শিশুর স্কন্ধে এমন গুরুভার তুলিয়া দিতে কি তাঁহার মনে একটুকুও ব্যথা বোধ হইল না? মিশ্রপত্নী অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়া বালকদুইটীকে তাহাদের অঙ্গ হইতে কেন রক্ত ঝরিতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়ের মত সস্নেহে আবার নিজেই বলিতে লাগিলেন—বুঝি বা ছেলেদুটীকে পাইয়া পথে কেহ প্রহার করিয়াছে। অমন সুন্দর ছেলে, যারা এদের অঙ্গে প্রহার করিয়াছে, তাদের কি প্রাণ নাই? নিতান্ত নির্দ্দয়-পাষাণ হৃদয় না হইলে কি এমন দেবোপম সুন্দর কিশোর বালকের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে? মিশ্র-পত্নী মনে মনে কত কি-ই না ভাবিতেছেন—এমন সময় বালকদুইটী বলিতে লাগিল—

তাঁহারা কহে মিশ্রঠাকুর মারিল।
তেঁহো কহে অসম্ভব মনে না লইল॥

মিশ্রঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু চোর॥
সুকোমল অঙ্গে সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দ্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥

মিশ্রপত্নী তো বালকদুইটীর কথায় একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। মিশ্রঠাকুর ব্রাহ্মণবালকদুইটীকে প্রহার করিয়াছেন—ইহা কি কখনো সম্ভব? ব্রাহ্মণবালকদুইটীকে প্রহার করা দূরের কথা, একটা রূঢ় বাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। তারপর এমন সুন্দর দুইটী কিশোর বালক, দস্যু চোর পর্য্যন্ত যাহাদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাওয়ার কথা, আর সেই সুকুমার বালকের সুকোমল অঙ্গে কিনা প্রহার করিবেন মিশ্রঠাকুর? না—ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে; ভয়ে বোধ হয়, ছেলে দুইটী প্রকৃত যে মারিয়াছে, তাহার নাম করিতেছে না। তাই মিশ্রপত্নী আবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের কে মারিয়াছে বাছা! নির্ভয়ে আমার কাছে বল, তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই।"

পুনঃ শিশু কহে মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥

শিশুদ্বয় আবার বলিল, হাঁ গো হাঁ, মিশ্রঠাকুরই আমাদিগকে প্রহার করিয়াছে। তাঁহার আঘাতেই আমাদের তনু এমন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও মিশ্রঠাকুরাণী ছেলেদুইটীর নিকট হইতে একই উত্তর পাইয়া—ব্যাপারটাকে আর এখন অসম্ভব

বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। মিশ্রঠাকুরকে কেনই বা এমন হঠাৎ কুমতিতে ধরিল। আহা! ছেলেদুইটীর সোনার অঙ্গে কি প্রাণে তিনি প্রহার করিলেন? শক্ত প্রহার না করিলে কি আর দেহ হইতে রক্ত পড়িতেছে? কি দিয়াই না জানি প্রহার করিয়াছেন—রাগের সময় তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না! মিশ্রঠাকুরাণী এইভাবে আকাশ-পাতাল কত কিই-না ভাবিতেছেন, তখন বালকদুইটী আবার বলিতে লাগিল—মা! আমরা মিশ্রঠাকুরের সন্নিকটেই ছিলাম। তিনি যে হঠাৎ আমাদের কেন এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলেন—তাহার কারণ আমরা কিছুই বলিতে পারি না। 'সন্নিকটে ছিনু মাত্র দোষগুণ এহি'—আমাদের দোষ-গুণ যাহা, আমরা তাঁহার সন্নিকটে ছিলাম। লৌহ-কণ্টকের ভীষণ আঘাতে তিনি আমাদের অঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন। এই দেখ না মা! আমাদের অঙ্গের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ—তাহা হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে।

এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া॥
শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত বরিষণ তরে॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে।
শুন দেখি এমন হইলা তুমি কবে॥
এ হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥

মিশ্রঠাকুর তো স্ত্রীর কথায় অবাক্! কৈ আমি তো কাহাকেও মারি নাই। কোন শিশুর সঙ্গে আদৌ আমার দেখাসাক্ষাৎও তো হয় নাই। ব্যস্তসমস্ত হইয়া মিশ্রঠাকুর তখন পত্নীকে বলিতে লাগিলেন— আমার উপর বৃথা রোষ করিতেছ কেন? ব্যাপার কি তাহা আমার নিকট খুলিয়া বল না! আমি তোমার কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোথাকার ছেলে, আর আমি প্রহার করিলাম বা কাহাদের?

ঠাকুরাণী কহে মহা প্রসাদের ভার।
জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥

মিশ্রপত্নী একটু শ্লেষবাক্য বলিলেন— ঐ যাদের স্কন্ধে নির্দয় হৃদয়-হীনের মত মহাপ্রসাদের ভার নিজ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে। এখন দেখিতে পাইতেছি আমার সম্মুখে আসিয়া সবই ভুলিয়া গিয়াছ? মিশ্র-ঠাকুর বলিলেন, কৈ আমি তো কাহাকেও দিয়া প্রসাদ পাঠাই নাই। এ কি এ যে অদ্ভুত কথা শুনিতে পাইতেছি!

তবে ঠাকুরাণী পুনঃ চমকিয়া কহে।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে॥
অপূর্ব্ব স্বরূপ ছুটি গৌর-কৃষ্ণ বর্ণ।
অতি সুকুমার অঙ্গে কর্ণেতে সুবর্ণ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইল যেন পুতুল পারা॥
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা॥

পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্রের হঠাৎ যেন চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, গীতাপাঠ কর্ত্তন করাতেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্বকৃত দোষক্রটীর কথা স্মরণ করিয়া মিশ্রঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে পর—

ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে॥
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্নাথের নিজ দেহ হয়ত সাক্ষাত॥
সেই গীতাপাঠ ছাটি তাহে আঁচড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥
"বহাম্যহং" পাঠে আমি অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল॥
জগন্নাথ-বলরাম আইল গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে॥

মিশ্রঠাকুর গদ্‌গদ কণ্ঠে পত্নীকে বলিতে লাগিলেন—"তুমিই ধন্য! ঘরে বসিয়া জগন্নাথ-বলরামের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে। আর আমি পাষণ্ড নরাধম। ভগবদ্বাক্যকে অবজ্ঞা করিলে, স্বয়ং ভগবান্‌কেই যে অবজ্ঞা করা হয়! সুতরাং তিনি আমার ন্যায় পাষণ্ড-নরাধমের সম্মুখে আসিবেন কেন? যাক্ আমার দুঃখ নাই—তুমি তো তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছ। অপরাধ করিয়াছিলাম—তিনিই প্রাণে আবার অনুশোচনা জাগাইয়া দিয়াছেন। সন্দেহ করিয়াছিলাম—তিনিই স্বয়ং আসিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া দিয়া গেলেন। আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়াছি।" এইসব বলিতেছেন, আর মিশ্রঠাকুরের নয়ন হইতে অঝোরে অশ্রুধারা বক্ষ

ভাসাইয়া মাটিতে পড়িতেছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মিশ্রঠাকুর প্রাণের আবেগে আবার বলিতে লাগিলেন—"ভগবান্ কত দয়ালু, নিদারুণ অন্যায় করিয়াছিলাম, কিন্তু তার প্রতিদানে পাইলাম কি ?—না, তাঁহারই করুণা —স্নেহ আশীর্ব্বাদ। আমাকে দিয়া ভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দিলেন, তাহা না হইলে আমার মত কত পাষণ্ডই হয়ত ভগবদ্বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত। অবিশ্বাসে অন্ধ হইয়াছিলাম, চোখে আঙ্গুল দিয়া তাই সব দেখাইয়া দিয়া গেলেন। আর সবই ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন—কিন্তু মানুষের অবিশ্বাস তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত দেয়। জীবের প্রতি তাঁহার কত স্নেহ, কত দয়া, কত মমতা।"

পণ্ডিত মিশ্র অবিশ্বাস করিয়াও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হন নাই। ভগবান্ বিশ্বাসীরও, আবার অবিশ্বাসীরও। ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসই মিশ্রঠাকুরের জীবনের শুভ-পরিবর্ত্তনের হেতু। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" —এই শ্লোকের অর্থ এখন আর মিশ্রঠাকুরের বুঝিতে বাকী নাই। এখন আর তাঁহার গীতার কোন শ্লোক সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় নাই। তাই—

ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষভরে তটস্থ হইয়া॥
'বহাম্যহং বহাম্যহম্' লেখে পুনঃ পুনঃ।
অপরাধ ক্ষেমাইতে করেন স্তবন॥

অদ্যাবধিও পণ্ডিত শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্রের গীতাটীকা পণ্ডিতসমাজে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। একেই তো মিশ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত, তদুপরি ভগবৎকৃপা লাভ করায় তাঁহার গীতাটীকা এক অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারিণী ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্রের গীতাটীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা॥
'বহাম্যহম্' 'বহাম্যহম্' তিনবার হয়ে।
অর্জ্জুন মিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়ে॥
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে।
যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে॥
অর্জ্জুন মিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপম।
ছলে কৃপা কৈল জগন্নাথ বলরাম॥
সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ।
কৃপা লাগি লালদাস করয়ে প্রার্থন॥

উপাখ্যান-বর্ণন শেষ হইল—আর কয়েকটী কথা লিখিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভগবানের প্রত্যেকটী কার্য্য জীবশিক্ষার দরুন। একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ জগদ্বাসীকে এইরূপ ভাবে কত উপদেশ এবং শিক্ষাই না দিতেছেন। তবু মোহান্ধ জীবের ভ্রান্তি অপসারিত হয় না। শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে—ইহা প্রমাণ করিবার দরুন ভগবান স্বয়ং যে কত অভিনয়ের অভিনেতা হইয়া গিয়াছেন এবং এখনো হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে দৈবীবস্তু যে বিশ্বাস, তাহাই দিনের পর দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে বিকৃত-রুচিসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষিতাভিমানীরা বিন্দু-মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। শাস্ত্রকে বিশ্বাস না করিলে, শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা না করিলে—এই জাতির সকল পথই রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। আদর্শ জীবন-গঠনের অব্যর্থ সঙ্কেত গীতা, ভাগবত, পুরাণাদির মাঝেই রহিয়াছে। এই

সব শাস্ত্রকে যদি আমরা প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন উন্নত হইবে কেমন করিয়া ? এক বিশ্বাসের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। বিশ্বাসহীন ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—আর দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তখন সকল রোগের বীজাণুই শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে। অধিকাংশের জীবনই আজকাল এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

ভগবানের জীবশিক্ষার লীলাকাহিনী পাঠ করিয়া সকলের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হউক—পরিশেষে ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা। ভক্তি-বিশ্বাস-লাভেচ্ছুর পক্ষে ভক্তের জীবনে ভগবানের মহিমা প্রকাশের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ অব্যর্থ ফলপ্রদ। সরল বিশ্বাসী না হইলে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না এবং ভগবৎকৃপা লাভ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্ব-উন্মেষের আর যতপ্রকার প্রণালীই অবলম্বন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ভক্তি-বিশ্বাস জীবনের মূল শিকড়—শিকড় উৎপাটন করিলে জীবনের উন্নতি তো দূরের কথা, জীবন রক্ষা করাই যে দায় হইয়া উঠিবে !

তুমি ত বৈরাগী হারি-জিত তেজি হৈলে

বৈষ্ণবধর্ম্মের দান অফুরন্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৈষ্ণবের লক্ষণ-সম্পর্কে অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে। যথা—

তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লৈবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিংবা ফলমূল খাব॥
সদা নাম লৈব যথালাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাজনগণ কি ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহা নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম—আচরণের ধর্ম্ম, বাগাড়ম্বর নাই তাহাতে। ছোটবেলায় অভিভাবকদের মুখে প্রায়ই একটি কথা শুনিতাম, "বৈষ্ণব হইতে ছিল মনে বড় সাধ, তৃণাদপি সুনীচেন ঘটাইল পরমাদ"। নিরভিমানী হইয়া ধর্ম্মের আচরণ বড়ই শক্ত। অথচ বৈষ্ণবধর্ম্ম যিনি বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন,

তাঁহারই শ্রীমুখের উক্তি—'তৃণাদপি সুনীচেন'। অভিমান বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, অভিমান-মঞ্চে আরোহণ করিয়া থাকিলে এই ধর্ম্মে বস্তুপ্রাপ্তির কোন আশাই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ অন্তরঙ্গ-ভক্ত ছিলেন—রূপ-সনাতন। বৃন্দাবনে এই দুই ভাগবত মহাজনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম যজন-যাজনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম'—তাঁহারা জীবগণকে শিক্ষা দিতেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং নিরভিমানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তাঁহারা। ভক্তিধর্ম্ম কিরূপ ত্যাগ-তিতিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সব বৈষ্ণব মহাজনদের চরিত অনুধ্যান করিলে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ছিন্ন কন্থা গায়ে দিয়া এবং শাকফলমূলভোজী হইয়া তবে তাঁহারা অপ্রাকৃত জগতের দুর্ল্লভ ভক্তিরত্নকে আহরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম এত সহজ নয়। সম্পূর্ণ ত্যাগের উপর এই ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকে বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম খুব সহজ; কিন্তু ভক্তিপথের মহাজন যাঁহারা, তাঁহাদের চরিত্র এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে কথাটা হুঁশিয়ার হইয়াই বলিতে হয়। প্রেমভক্তির অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা কত ত্যাগী, কত নিষ্কিঞ্চন ছিলেন। ভোটকম্বলকে পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নকন্থা গায়ে দিয়া তবে মহাজনগণ কঠোর ত্যাগের অভিনব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সব বৈষ্ণব-মহাজনদের স্মরণ করিলেও পুণ্য হয়। আজ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের চরিত আলোচনা করিয়া মলিন চিত্তকে মার্জ্জনা করিবার প্রয়াসী হইলাম।

শ্রীজীব গোস্বামী হন তত্তুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত॥

ক্রমসন্দর্ভ আর ষট্সন্দর্ভ আদি।
নানা গ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিরসিলা বাদী॥
শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রশিষ্য হন।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্ষদপ্রধান॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশায়॥
ষট্সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে।
যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বলে॥
পণ্ডিত-অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥
ষট্সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ।
অন্য কলকলে তার নাহি ফিরে মন॥
যেইজন ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞির বিনে।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগ্রন্থমধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল—শ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত জীব গোস্বামী-সংগৃহীত—ষট্সন্দর্ভ। অতি প্রাচীনকালে মাধ্বমতানুগামী বৃদ্ধ মহাজনগণ এই সন্দর্ভ ক্ষুদ্রভাবে, তৎপরে গোপালভট্ট গোস্বামী কিঞ্চিৎ বৃহৎরূপে সঙ্কলন করেন। কালক্রমে তাহাও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও ক্রমভঙ্গ হইয়া যায়। পরম্পরাক্রমে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উহা প্রাপ্ত

হইয়া যথারীতি পর্য্যায়ক্রমে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বৃহৎরূপে সঙ্কলন করেন। তাহার নামই ষট্সন্দর্ভ। পূর্ব্বে তাহা ভাগবত-সন্দর্ভ নামে প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থারম্ভেই গোস্বামিপাদের অতুলনীয় গুরুভক্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডিত্য তাঁহার গুরুভক্তিকে বিস্মরণ করাইয়া দেয় নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥

অনন্তর মন্ত্রগুরু ও ভাগবতার্থপ্রদ গুরুবর্গকে নমস্কার করিয়া ভাগবত-সন্দর্ভকে গ্রন্থন পূর্ব্বক লিখিবার নিমিত্ত বাঞ্ছা করিতেছি।

প্রমাণ এবং যুক্তিবিচারে সুনিপুণ না হইলে সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রকাশ অন্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ছিল; কিন্তু পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার থাকিলে দীন-দয়াল ভগবানের কৃপালাভ হয় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্॥

বৃন্দাবনে তখন রূপ-সনাতনের খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত। ভজন-পরায়ণ এবং পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন রূপ এবং সনাতন উভয়েই। বাদ-বিতণ্ডা লইয়া অনর্থক সময়ের অপব্যবহার না করিয়া ভজনে এবং গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহারা তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

দিগ্‌বিজয়ী এক সর্ব্বত্র জিনিয়া।
ব্রজে রূপ-সনাতন পণ্ডিত জানিয়া॥

বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।
নির্ম্মৎসর অহঙ্কারশূন্য দুইজনে॥

সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-সনাতনকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিবার জন্য বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। মাৎসর্য্যবিহীন এবং অহঙ্কারশূন্য মহাজন রূপ-সনাতন—

বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞির স্থানে গেলা॥
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে॥
কহে রূপ-সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে॥
তুমিও বিচার কর, নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইলা অসহ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥

তেজস্বী বৈষ্ণব শ্রীজীব দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারকে সহ্য করিতে পারিলেন না। আর পারিবেনই বা কেন? শ্রীজীবেরও ত কুশাগ্রবুদ্ধি এবং বিচারদক্ষতা কম ছিল না। রূপ-সনাতনের মত বয়সের পরিণতি তখনো তাঁহার ঘটে নাই। তা ছাড়া গুরুনিন্দনে তিনি আরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা যে রূপ-সনাতন বিচারের ডরে বিজয়-পত্র লিখিয়া দিয়াছেন? পাণ্ডিত্য

ত শ্রীজীবেরও কম ছিল না, কাজেই বিনা বিচারে জয়পত্র তিনি লিখিয়া দিবেন কেন ? অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যের কথা তাঁহার স্মৃতিপটে যত না জাগ্রত ছিল, রূপ-সনাতনের অপমান তাঁহার পক্ষে ততোধিক অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষটায় আর না পারিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াই বসিলেন—

এই ভাবি কহে, তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্র-প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে ॥
সে যা হউ তাঁহা সভা সহিত বিচারে।
তুমি ত না হও যোগ্য, তেঁহো থাকু দূরে ॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য-অভিমানী।
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জানি ॥

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর তুমুল তর্কযুদ্ধ হইল ; কিন্তু হারিবার পাত্র শ্রীজীব নহেন। দিগ্বিজয়ীকে বিচারশৈলীদ্বারা শ্রীজীব পরাস্ত করিয়া দিলেন।

এ কথা শুনিয়া রূপগোসাঞি কুপিয়া।
জীবগোসাঞিরে কহে ভর্ৎসনা করিয়া ॥
তুমি ত বৈরাগী হারি-জিত তেজি হৈলে।
তবে কেনে জিতিবারে আগ্রহ করিলে ॥
সেই ব্যক্তি হারি-জিত অভিমানময়।
তাহার হৃদয়ে হয় জয়-পরাজয় ॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া ॥

বিতর্কে যোগদান করিলেই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার এক দুর্নিবার ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয়। এই বৃত্তি ত বৈষ্ণবধর্ম্ম-পোষক নহে, বরঞ্চ বাধক। তর্কে যে-সব অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, শ্রীজীব তাহার কোনটাই নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রীজীবের প্রতিভার নিকট দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও হার মানিতে বাধ্য হইল। কিন্তু শ্রীজীব যদি কেবল পণ্ডিত হইতেন, তবে কোন কথা ছিল না। গোস্বামিপাদ যে পণ্ডিত-বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের ভূষণ একমাত্র দীনতা। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের আসল কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু অহঙ্কারের জন্যই নহে, গুরুনিন্দা শুনিতে নাই, ইহাও শাস্ত্র-বচন। শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও শ্রীজীবের মনে তেজের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান কথাই হইল—'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'। গোস্বামিপাদ এক দিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, মহাজনের উপদেশকে আর এক দিকে অমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী জোর দিলেন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান বিধিলঙ্ঘনজনিত অপরাধের দিকে। শিষ্য প্রত্যুত্তরে যোগ্য কথাই বলিলেন—

তেঁহো কহে কৈল মোর গুরুনিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥

এইখানেই ত কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত। শ্রীজীব নিজেকে শাসনকর্ত্তার আসনে বসাইয়া ফেলিলেন। এই ত অপরাধ। বৈষ্ণব ত কর্ত্তার অভিমানে অভিমানী নহেন। অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দেওয়াই যে বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। বৈষ্ণব যে ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের দাসানুদাস। গণনায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদের এইখানেই প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, যাঁহাদের মর্য্যাদারক্ষণের জন্য শ্রীজীব এত ব্যস্ত,

তাঁহারা স্বয়ং যে বিজয়-পত্রিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর ত আর কোন কথাই খাটে না। বৈষ্ণবকে অক্রোধী হইতে হইবে। শ্রীজীবের যদি ক্রোধেরই সঞ্চার হইয়াছিল, তবে ক্রোধের উপর তাহার কেন ক্রোধ হয় নাই, রূপগোস্বামীপ্রভুর ইহাই ছিল আশয়।

জীবগোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোসাঞি ॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভক্তি করি।
লোক শিখাবার হেতু তাঁহার উপরি ॥

লোকশিক্ষক শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার নিজের শিষ্যকেই যদি শাসন করিয়া খাঁটী না করেন, তবে তাহা করিবে আর কে? সব দিকেই যে শ্রীজীব গুণান্বিত তাহা রূপগোস্বামিপাদ ভালভাবেই জানিতেন। তবুও একদিকেই বা ত্রুটি থাকে কেন? এই জন্যই—

কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক ॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন নহিলা ॥
অন্নজল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে ॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
বিশীর্ণ হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে ॥

গুরুগতপ্রাণ শ্রীজীব, গুরুর মনে ব্যথা দিয়াছেন—এই ভাবিয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। এই তুচ্ছ জীবন তিনি আর রাখিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যমুনার তীরে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

সময় না হইলে কোন কিছুরই প্রতিকার হয় না। অনাহারে শ্রীজীব জীর্ণশীর্ণ দেহে শুধু প্রাণটুকু লইয়া পড়িয়া আছেন—এই খবর শ্রীল সনাতনগোস্বামীর কানে গিয়া পৌছিল।

কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন।
শুনিয়া খেদিত হইলা শ্রীল সনাতন॥
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তারে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥

রূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা—শ্রীল সনাতন। বড়ভাই ছোটভাইয়ের কাছে গিয়া কৌশলে একটী প্রশ্ন করিলেন। আচ্ছা ভাই! সদাচারের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ?

শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥

জীবে দয়াই যদি শ্রেষ্ঠ সদাচার হয়, তবে ভাই, শ্রীমান্ শ্রীজীব কি জীবের মধ্যে গণ্য নহে?

গোঁসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহো বুঝিলা হৃদয়॥

রূপ-সনাতন উভয়েই বিচক্ষণ চতুর। সনাতনের বাক্যের মর্ম্ম রূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারও যে বিচারে ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ভুলসংশোধনের জন্য—

যে আজ্ঞা বলিয়া জীবগোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছল ছল আঁখি॥

গুরু-শিষ্যের মান-অভিমানের পালা শেষ হইয়া গেল। এক প্রাণস্পর্শী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। ছোটভাই অনুপমের পুত্র শ্রীশ্রীজীব। তাঁহাকে কষ্ট দিয়া শ্রীরূপও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আচার্য্যের কঠোরতা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের ভাবকে সম্বন্ধ-সূত্রের স্মৃতি শিথিল করিয়া দিল। শ্রীজীব ত কেবল শিষ্যই নহে, সে যে আমার পরম স্নেহের আদরের পাত্র। লোকশিক্ষার জন্য একদিকে কঠোরতা দেখাইয়া বজ্রাদপি কঠোর চিত্তও গলিয়া জল হইয়া গেল। রূপ শ্রীজীবকে বুকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীজীবের তপস্যা সফল হইল। প্রাণের ব্যথা গুরুর—আত্মীয়ের পরশে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গেল। বিচারে গুরু-শিষ্য উভয়ের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত লীলা-ভুলের মার্জ্জনা হইল। একদেশদর্শী বিচারে শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবের যে ত্রুটি ছিল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠভ্রাতা—গুরু শ্রীল সনাতন তাহার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া দিলেন। 'নিরপেক্ষ না হইলে, না যায় ধর্ম্মরক্ষণ'—মহাপ্রভুর এই উপদেশের মর্য্যাদা আরও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সকল তাপ, সকল বেদনা, সকল দুঃখের অবসান হইল—গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই।

শ্রীজীবগোসাঞি কৃতকৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া॥

শ্রীজীব, গুরু শ্রীরূপের চরণে প্রণাম করিয়া ধন্য কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন। শ্রীজীবের শিক্ষা, আজও জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কঠোরতার ভিতরও যে অমৃত-নির্ঝরিণী থাকে, শ্রীরূপও জগৎকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বেদান্তাচার্য তত্ত্ববাচস্পতি শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী-প্রণীত

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী

১ গুরুশিষ্যপরম্পরা

গুরুশিষ্যপরম্পরাই যে ভারতীয় আর্য্যজাতির সনাতন ধারা, এই পুস্তিকায় তাহা শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের উক্তি অবলম্বনে প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণা : ২৫ পঃ।

২ বেদান্তবিদ্ গুরু

এই পুস্তকে সংক্ষেপে বেদান্তের মতবাদ, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য এবং বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশের জন্যই যে সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠা, তাহা সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। দক্ষিণা : ২৫পঃ

৩ জয়গুরু

এই পুস্তকে 'জয়গুরু' শব্দের বিশ্লেষণ, 'জয়গুরু' নামের অর্থ এবং 'জয়গুরু' নামের মহিমা খ্যাপন করিয়া 'জয়গুরু' যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য অসাম্প্রদায়িক নাম, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে মহামিলন-সূত্র, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। দক্ষিণা—২৫ পয়সা মাত্র।

৪ সাধন-জীবনে

সাধন-জীবনের পাথেয় এবং পথনির্দেশসম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সাধন-জীবনের কণ্ঠহার। আত্মকল্যাণকামী সাধক এই গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতে পারিবেন—সঞ্চয় করিতে পারিবেন শক্তি ও সাহস—প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন সবলে দুর্ব্বলতাকে—যে দুর্ব্বলতায় আনে সাধকের পতন বা মরণ! দক্ষিণা—এক টাকা।

৫ শ্রেষ্ঠদান

"আত্মার স্বরূপজ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠদান"—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ২৫পঃ।

৬ শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস

ভক্তিরসপিপাসু জনগণের নিত্য পাঠ্য। পড়িতে পড়িতেই ভক্তির সঞ্চার হয়। দক্ষিণা ৫০ পয়সা মাত্র।

৭ গুরুশক্তিসঞ্চার-মাহাত্ম্য

আলোচ্য পুস্তিকায় গুরুশক্তিসঞ্চার-মাহাত্ম্যসম্পর্কে এমন প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, একদিকে তাহা যেমন শিষ্যবর্গকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে, অন্যদিকে গুরুশক্তিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকেও এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিবে। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যপাঠ্য। দক্ষিণা—২৫ পয়সা মাত্র।

৮ তাঁহারি প্রকাশ

ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশ গুরুমূর্ত্তি। জ্ঞান এবং ভক্তিপথের সিদ্ধান্ত লইয়া গুরুকে কি ভাবে ভাবিতে হইবে, তাহার প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই পুস্তিকায়। গুরুপদাশ্রিত শিষ্যমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। এই পুস্তিকা পাঠে সকল সংশয়ের হয় চির অবসান। দক্ষিণা : ২৫ পয়সা।

৯ শিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ম্মরূপ। তাঁহার রচিত এই শ্লোকাষ্টক পাঠ করিলেই আচার এবং প্রচার যুগপৎ এই দুই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত শিক্ষাষ্টক শ্লোকেই পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। ভক্তজনগণের নিত্যপাঠ্য এবং নিত্যসঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত এই পুস্তিকাখানা। দক্ষিণা—৫০ পয়সা মাত্র।

১০ মায়েদের ঠাকুর

'মায়েদের ঠাকুর' গ্রন্থে ঠাকুর যেন মায়েদেরই হইয়া গিয়াছেন প্রেম-প্রীতি ভালবাসার মাধ্যমে স্বামীর ভিতর জগৎস্বামী বা জগদ্গুরুর দর্শন কি করিয়া লাভ করা যায়, তাহারই অভিনব সঙ্কেত এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। গৃহিণী মায়েদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য।

আশ্বাস-বাণীতে নৈরাশ্যের মাঝেও জাগে পরম আশা, সংসারে থাকিয়া স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবা করিয়াও ঈশ্বরলাভ সম্ভব—এই নিশ্চিত বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়। প্রত্যেক মায়ের পক্ষে এই পুস্তকখানা অবশ্য-পাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। দক্ষিণা—দুই টাকা মাত্র।

১১ গুরুপূর্ণিমা

গুরুপূর্ণিমা-রহস্য-উদ্ঘাটনে প্রতিভা-আলোক সম্পাত করিয়াছেন খ্যাতনামা মনীষী 'অনির্বাণ'। তাঁহার লিখিত গুরুপূর্ণিমা-পরিচিতি সম্পূর্ণ অভিনব। ইতিপূর্ব্বে আর এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। গুরুবাদ হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। গুরুবাদ সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধুসন্তদের অভিমতও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গুরুচরণাশ্রিত প্রত্যেক শিষ্যের এই গ্রন্থখানা নিত্যসঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এই গ্রন্থ কাজে লাগিবে। দক্ষিণা—দুই টাকা মাত্র।

১২ ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

ইহার প্রতি খণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে লেখকের অন্তরের রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তচরিত্রের নিগূঢ় মাধুর্য্যের তাৎপর্য্য সরস, সরল, অনবদ্য এবং অনুপম স্বামীজীর বাচনভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। ভগবৎপ্রেমলাভের বৈজ্ঞানিক ধারাটি স্বামীজী মহারাজ সকলের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে-পথ দেখাইয়াছেন, সে-পথে পরাজয়ের ভয় নাই, পরন্তু জয়লাভ সুনিশ্চিত। প্রত্যেক ভক্তের পক্ষে এই পুস্তকখানা অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। দক্ষিণা—১ম খণ্ড ২·৫০, ২য় খণ্ড ২·০০, ৩য় খণ্ড ৩·০০, ৪র্থ খণ্ড ৩·০০।

(১৩) ভাগবতোত্তম ০·৫০, (১৪) সন্ন্যাসীর সাধনা ০·৫০, (১৫) হরিদাসের বিজয়োৎসব ১·০০, (১৬) আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ ৩·০০, (১৭) পঞ্চদশী-প্রদীপ ২য় ৫·০০, ৩য় ৫·০০, (১৮) নিগম-শক্তিকূট ০·২৫, (১৯) নিগমাদিত্যরশ্মি ০·১০, (২০) ভগবান্-

গুরু বা জগদ্গুরু ১·২৫, (২১) অলৌকিক শক্তিধর ঠাকুর নিগমানন্দ ০·৫০, (২২) চাবিকাঠি শ্রীগুরুর হাতে ০·৫০, (২৩) ভাষণ ৪·০০, (২৪) শিষ্টাচার ০·৫০, (২৫) আকাশ-শরীর সদ্গুরু ১·০০, (২৬) আবেশ ও অনুপ্রবেশ ২·০০, (২৭) বৈদিক যুগে আচার্য ও শিষ্যের সম্পর্ক ২·৫০, (২৮) সত্য-বাণী ০·৫০, (২৯) সত্য-ভাষণ ১·০০, (৩০) তৎ তু সমন্বয়াৎ ২·০০, (৩১) সনাতনধর্মপ্রচারক সদ্গুরু নিগমানন্দ ৩·০০, (৩২) গুরুব্রহ্মবাদ ৩·০০, (৩৩) বোধন-মন্ত্র ১ম ০·৫০, ২য় ০·৫০, ৩য় ০·৫০, (৩৪) ভাববিনিময় ১·০০, (৩৫) নিগম-সিদ্ধান্ত ১·০০, (৩৬) ঠাকুরের চিঠির বিশ্লেষণ ১·০০, (৩৭) আদিগুরু কে? ০·৫০, (৩৮) যোগবাশিষ্ঠের সপ্তভূমিকা ও তত্ত্বস্ফুরণ ০·৫০, (৩৯) মুক্তপুরুষ-স্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে ০·৫০, (৪০) অনধিকারীর হাতে লক্ষ্যবিকৃতি ০·৫০, (৪১) শ্রীগুরু ০·৫০, (৪২) গুরুত্ববোধই গুরু ০·৫০, (৪৩) গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র ০·৫০, (৪৪) সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ ৫·০০, (৪৫) ভক্তসম্মিলনী ১·০০, (৪৬) নিগমানন্দের সমাধি-অভ্যাস ৪·০০, (৪৭) বেদান্তধর্ম ১·০০, (৪৮) ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায় ০·৫০, (৪৯) গুরুবাদ ও গুরুশিষ্য-পরম্পরা ১·০০, (৫০) স্বরূপানুসন্ধানের নামই ভক্তি ০·৫০, (৫১) গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে স্বয়ং ভগবান্ ০·৫০, (৫২) গুণিসংবর্ধনা ০·৫০।

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন, পোঃ ও জেলা হাওড়া।
(২) দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর, ২৪ পরগণা।
(৩) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
(৪) উদ্বোধনী গ্রন্থপীঠ, পূর্ব পুঁটিয়ারী বাজার, কলিকাতা-৩৩।
(৫) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

অভিমত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী-প্রণীত নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী সম্পর্কে

The Amritabazar Patrika (Daily), (8th. May, 1960) says—

(1) Sri Jagannathi Madhabdas. 50 nP. **(2) Srestha-Dan.** :25 nP. by Swami Satyananda Saraswati. Published by Sri Krishna Kumar Nag, 28, Shyampukur Street, Calcutta-4. In Bengali.

It has been said that all the rivers run into the sea ; yet the sea is not full. Our devotion to the supreme being is like a river. God Himself is the sea. The more we resign ourselves to the Will of the Lord,—the more calm in our mind and out of peace comes forth ecstasy which cannot be described in words. The search of God by desireless mind becomes the search for pleasure – but this is a different type of pleasure enjoyed by a different type of personality.

Sri Jagannathi Madhabdas was a saintly devotee of the personality type given above, basing on the "Bhaktamal" Swami Satyananda Saraswati writes an inspiring biography which points to an ideal of the highest type.

One who elucidates to you the true nature of Reality and of your own-self offers you the best of things in this universe. This is the gist of "Srestha-Dan."

The volume will open new windows into your soul.

'সাধন-জীবনে' সম্পর্কে ৮ই ফাল্গুন রবিবার ১৩৬৬ বাং সনের **আনন্দবাজার পত্রিকা** বলেন—

গ্রন্থকার সাধক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সাধন-জীবনে অগ্রসর হইবার পথের অন্তরায়সমূহের সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন এবং সেগুলির রীতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমগ্র আলোচনা তাঁহার সাধনানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট। অধ্যাত্ম-জীবনে অভীপ্সু ব্যক্তিগণ স্বামীজীর ন্যায় ত্যাগী পুরুষের উপদেশবাণী পাঠ করিয়া বিশেষ-ভাবে উপকৃত হইবেন।

শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস সম্পর্কে ২৬শে চৈত্র ১৩৬৬ বাং সনের শনিবারের সাপ্তাহিক **দেশ পত্রিকা** বলেন—

ভক্তমাল প্রসিদ্ধ-বৈষ্ণব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে পরমভক্ত মাধবদাসের জীবনী গৃহীত হইয়াছে। ভক্তমালের পদ্য রচনা গ্রন্থকারের সরল গদ্য ভাষায় ছন্দোময় রূপ লাভ করিয়াছে। সরস্বতীজী সাধক এবং তিনি নিজে একজন মুক্ত পুরুষ। ভক্তমহিমা-কীর্ত্তনে তাঁহার বাচন-ভঙ্গী ছত্রে ছত্রে অনবদ্য মাধুর্য্য বিকিরণ করিয়াছে; স্থানে স্থানে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ভক্ত-জীবনের গূঢ় রসানুভূতিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠে আগ্রহ জাগ্রত থাকে। ভক্তরসপিপাসু মাত্রেই পুস্তকখানি পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন।